মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম সংস্করণ : বৈশাখ : ১৩৬০
দ্বিতীয় সংস্করণ : আশ্বিন : ১৩৬২

প্রকাশক ॥ শ্রীমলয়েন্দ্রকুমার সেন
ক্যালকাটা পাবলিশার্স
১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২
মুদ্রাকর ॥ শ্রীঅবনীমোহন পালচৌধুরী
জাতীয় মুদ্রণ ॥ ৭৭, ধর্মতলা ষ্ট্রীট
প্রচ্ছদ শিল্পী ॥ অজিত গুপ্ত
প্রচ্ছদ মুদ্রণ ॥ নিউপ্রাইমা প্রেস
১১, ওয়েলিংটন স্কোয়ার

STATE ... RARY

॥ দাম আড়াই টাকা ॥

ফে   রি   ও   লা

গত দু' তিন বছর ধরে গল্পগুলি বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। গল্পগুলি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে লেখা কিন্তু গল্পগুলির মধ্যে সমসাময়িক সামাজিক জীবনের মূলসূত্রের একটা যোগাযোগ আছে বলেই আমার বিশ্বাস।

আমি সেই ভাবেই গল্পগুলি বাছাই করেছি। অবশ্য এ বিচার পাঠক-পাঠিকা এবং সমালোচকের। আমি কেবল এই সংকলনটির জন্য গল্প বাছাই করার নীতির কথাটা উল্লেখ করলাম।

লেখক

বৈশাখ, ১৩৬০

ফেরিওলা

বর্ষাকালটা ফেরিওলাদের অভিশাপ।

পুলিশ জ্বালায় বারোমাস। ছ'মাসে বর্ষা হয়রানির একশেষ করে। পথে ঘুরে ঘুরে যাদের জীবিকা কুড়িয়ে বেড়ানো তাদের প্রায় পথে বসিয়ে দেয়।

না ঘুরলে পয়সা নেই ফেরিওলার। তার মানেই কোনমতে পেট চালানোও বরাদ্দ নেই

আকাশ পরিষ্কার দেখেই জীবন বেরিয়েছিল। ঘণ্টাখানেক ঘুরতে না ঘুরতে বৃষ্টি নেমে এসেছে।

পুরানো জীর্ণ বাড়ীটার ঢাকা বারান্দায় আশ্রয় নিয়ে মনে মনে সে বর্ষাকে অভিশাপ দেয়।

কিন্তু দেহটা যেন সায় দিতে রাজী হয় না। খানিকক্ষণ বিশ্রাম করার সুযোগটাকে সাগ্রহে বরণ করতে চায়। দিন দিন যেন আরও বেশী বেশী দুর্বল মনে হচ্ছে শরীরটা।

বর্ষা বাদ সেধেছে রোজগারে, খাওয়া আরও কমে গেছে আপনাথেকে, সেইজন্য কি?

এক কাঁধের শাড়ী চাদর আর অন্য কাঁধের গামছাগুলির ওজন খুব বেশী নয়। ভারি হওয়ার মত বেশী মাল সে কোথায় পাবে? এই সেদিন পর্যন্ত শুধু গামছাই ফেরি করত, কয়েক মাস যাবৎ কিছু শাড়ী আর বিছানার চাদর নিয়ে বেরোয়।

তবু এইটুকু ওজন কাঁধে নিয়ে ঘণ্টাখানেক ঘুরেই যেন গায়ের জোর ফুরিয়ে আসে, হাঁটতে রীতিমত কষ্ট হয়। 'শাড়ী চাদর গামছা চাই' বলে হাঁক দিতে যেন দমে কুলোয় না, বুকে লাগে, কাসি আসে।

ঃ শাড়ী আছে ?

পাশের দরজার একটা পাট খুলে দাঁড়িয়েছে ছ'সাত বছরের হাফপ্যাণ্ট পরা একটি মেয়ে। কিন্তু জিজ্ঞাসাটা তার নয়। দরজার আড়াল থেকে মেয়েলি গলায় প্রশ্নটা এসেছে।

ঃ শাড়ী আছে মা। নেবেন ?

ঃ কৈ দেখি।

একদিকে মিশ কালো অপর দিকে টুকটুকে লাল পাড়ওলা মিহি শাড়ীটা জীবন ছোট মেয়েটির হাতে তুলে দেয়। তার সাধারণ মোটা তাঁতের শাড়ীর মধ্যে এখানাই সব চেয়ে সেরা এবং সব চেয়ে দামী কাপড়। আজ প্রায় দশ বার দিন কাপড়টা নিয়ে ঘুরছে, বিক্রী হয়নি। দাম শুনে সবাই ফিরিয়ে দেয়। দরদস্তুর পর্যন্ত করে না।

এখানেও তাই ঘটে। দাম শোনার পর ফিরে আসে কাপড়টা।

ঃ কম দামের নেই ?

তিন চারখানা রঙীন তাঁতের শাড়ী মেয়েটির হাতে ভিতরে যায় আসে, আসল দরদস্তুর সুরু হয় লাল পাড়, ফিকে সবুজ জমির শাড়ীখানা নিয়ে। জিনিষটার গুণকীর্ত্তন করতে করতে জীবন দশ টাকা থেকে নামে, অপর পক্ষ চার টাকা থেকে অল্পে অল্পে ওঠে। রফা হয় ছ'টাকায়।

দর করতে পাকা হয়ে উঠেছে মেয়েরা। ফেরিওলাকে একেবারে অর্ধেকের চেয়ে কম দাম বলে বসতে পুরুষের সঙ্কোচ হয়, মেয়েদের একবার ভাবতেও হয় না।

একটি টাকা আর সিকি দুয়ানিতে মিলিয়ে মেয়েটি দু'টি টাকা তুলে দেয় জীবনের হাতে।

ঃ বাকীটা দু'দিন পরে নিও।

ঃ ধারে তো দিতে পারব না মা। সামান্য কারবার, দাম ফেলে রাখলে পোষায় না মা।

বাকীতে মাল দিতে হয় জীবনকে। দুপুর বেলা ঘরের মেয়েদের সঙ্গে বেচা-কেনা, মেয়েদের হাতে শুধু টাকা না থাকার জন্যই নয়, টাকা থাকলেও অনেক সময় কর্তাকে দিয়ে কেনাটা আগে মঞ্জুর করিয়ে নেবার জন্যও বাকীতে নেওয়া দরকার হয়। মঞ্জুর না হলে যাতে ফিরিয়ে দেওয়া চলে পরদিন।

অচেনা বাড়ী অচেনা মানুষ হলেও এটা মেনে নিতেই হয় ফেরিওলাকে। দুয়ারের কাছে বসে ঘরসংসার যেটুকু দেখা যায় দেখে আর সামনে এসে যে মানুষটা জিনিষ পছন্দ করে কেনে তার বেশভূষা চালচলন থেকে ফেরিওলা আঁচ করে নিতে পারে ধারে মাল রেখে যাওয়া নিরাপদ কি না।

কিন্তু এভাবে ফেরিওলার সামনে বেরোতে লজ্জা করাটা রহস্যজনক অস্বাভাবিক ব্যাপার। ফেরিওলাকে মেয়েরা লজ্জাও করে না, ভয়ও করে না।

এ অবস্থায় টাকা বাকী রাখা যায় না। কালপরশু এসে হয়তো শুনবে, কই, এ-বাড়ীতে কেউ তো কাপড় রাখেনি তোমার কাছে! কাকে তুমি কাপড় দিয়েছিলে, কে রেখেছে তোমার কাপড় ?

ভেতর থেকে মেয়েলি গলায় আবার মিনতি মেশানো উপরোধ আসে, দু'দিন বাদে এলেই ঠিক পেয়ে যাবে।

বাকী দিতে পারব না মা।

কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ কাটে। তারপর দরজার দুটি পাট খুলে এসে দাঁড়ায় শ্যামবর্ণা একটি বৌ। লাল পাড় ফিকে সবুজ জমির নতুন শাড়ীটিই সে পরেছে।

করুণ কণ্ঠে বলে, মা বলে ডেকেছ, বাকী না রেখে গিয়ে পারবে না বাবা। গা থেকে খুলে নিতে হবে। তোমার সামনে আসতে পারিনি, তোমার কাপড়টি পরে তবে এলাম।

এ জুলুমের প্রতিকার নেই। আধঘণ্টা পরে বৃষ্টি ধরলে জীবন বিরস মুখে পথে নেমে যায়। সহরতলীর সহরে আর গেঁয়ো পথে ধীরে ধীরে হাঁটে আর মাঝে মাঝে হাঁক দেয়। সহর আর গ্রাম সহরতলীতে একাকার হয়ে যায়নি এখনো, পাশাপাশি ঘেষাঘেষি হয়ে এসেছে। এখানে ওখানে শুধু মিশে গেছে খানিকটা। শুধু একটা ইটের প্রাচীরের ব্যবধান হলেও পানাপুকুরটা খাপ খায়নি নতুন ঝকঝকে সিনেমা হলটার সঙ্গে।

কত রকমারি জিনিষের কত ফেরিওলা যে পথে নেমেছে এই সহরতলীর। কিন্তু জীবন জানে তার হাঁক শুনলে, ছিটকাপড় সায়া ব্লাউজওলার হাঁক শুনলে, সব চেয়ে বেশী উৎসুক মুখ উঁকি দেয় জানালা দিয়ে, তারাই আকর্ষণ করে সব চেয়ে বেশী লুব্ধ দৃষ্টি।

সন্ধ্যার আগে শ্রান্ত অবসন্ন দেহে জীবন সহরতলীর সীমান্তে তার ঘরের দিকে পা বাড়ায়। এলুমিনিয়ামের বাসনের ঝাঁকা মাথায় একজন এগিয়ে আসছিল তারই মত শ্রান্ত পায়ে; দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞাসা করে, শাড়ীর কেমন দাম ভাই?

ঃ তের-চোদ্দ জোড়া হবে।

ঃ তের-চোদ্দ !

ঃ এগার টাকার নীচে নেই।

সে নীরবে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যায়।

বীণা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করে, কি রকম হল ?

ঃ সুবিধে নয়।

প্রায় ছেঁড়া ন্যাকড়া হয়ে গেছে বীণার কাপড়টা। ঘরে সে এটাই পরে। চৈতন বাবুর বাড়ী খাটতে যাওয়ার জন্য একমাত্র সম্বল একখানি আস্ত কাপড় সে সযত্নে তুলে রাখে। আপিসে যাওয়ার জন্য ওদিকের ঘরের অঘোরের মত একটি ধুতি, একটি পাঞ্জাবী আর একটি গেঞ্জির সেটটি প্রাণপণে বাঁচিয়ে চলার মত। টেনেটুনে যতদিন চালানো যায়।

গামছা আর শাড়ীচাদরের বোঝা নামিয়ে জীবন চৌকীতে সটান শুয়ে পড়লে, বীণা ভূমিকা সুরু করে দেয়, শুনলে তো তুমি রাগ করবে, কিন্তু কি করব বল উপায় ছিল না.—এলুমিনিয়ামের একটা হাঁড়ি কিনেছি ফেরিওলার কাছে।

একটু থেমে বলে, আগের হাঁড়িটা ফুটো হয়ে গেছে ক'দিন। তোমার রকমসকম দেখে আমি বাবু বলতে ভরসা পাইনি। ভাত তো রাঁধতে হবে, পিণ্ডি ? মাটির হাঁড়িটাতে চাল রাখতাম, কদিন সেটাতে ফুটিয়েছি। আজ সকালে সেটাও ফেঁসে গেছে।

জীবন কিছু বলে কিনা শোনার জন্য খানিকটা থেমে আবার বলে, একটু চালাকি করে বাকীতে রেখেছি ! ওইটুকু হাঁড়ি, তার দাম সাতসিকে ! দরদস্তর করে পাঁচসিকেয় রাজী করালাম। তা পাঁচসিকে পয়সাই বা দিই কোত্থেকে ? বললাম, ফুটো ফাটা আছে কিনা দেখে কাল দাম দেব। কিছুতে বাকীতে দেবে না। কি

করি? উনুনটা ধরেনি তখনো ভাল করে। হাঁড়িটা চটপট মেজে জল আর চাল দিয়ে ধোঁয়ার মধ্যেই চাপিয়ে দিলাম। ভেতরে ডেকে এনে দেখালাম। বললাম, কি করি বল, উনুনে চাপিয়ে দিয়েছি, ধারে না দিলে উনুন থেকে নামিয়ে নিয়ে যেতে হয়। গজর গজর করতে করতে চলে গেল।

নতুন হাঁড়িতে ভাত রান্না হয়েছে। ভাতে কি একটু নতুনগন্ধ লাগবে? বোঁটকা গন্ধটা একটু কেটে যাবে, ঠাণ্ডা হয়ে আসতে আসতে কড়কড়ে হয়ে যাবে না?

অবসাদ কল্পনাতেও কেমন ছেলেমানুষী রঙ লাগিয়ে দেয়! বাচ্চা দুটোর সঙ্গে বসে চ্যাঁড়স চচ্চড়ি আর ডাল দিয়ে ভাত খেয়ে জীবন ঘুমিয়ে পড়ে।

সকালে মুষলধারে বৃষ্টি।

শেষ রাত্রে নেমেছে। টুপটাপ জল পড়ে পড়ে ঘরের ভিতরটা অর্ধেক ভেসে গিয়েছে। ছাতটা একটু কাত হয়ে আছে একদিকে। কে জানে এভাবেই তৈরী হয়েছিল কিনা অথবা এটা প্রাচীনত্বের ফল। ধ্বসে পড়ুক আর যাই হোক, ভাগ্যে ছাতটা একটু কাত করা! এপাশে জল চুইয়ে এলেও সরাসরি ঝরে না পড়ে ছাত বেয়ে খানিকটা গড়িয়ে গিয়ে ঝরে—তাই চৌকীটা রক্ষা পায়।

রক্ষা পায় ছেঁড়া তোষক বালিশ জামা কাপড়ের সঙ্গে নতুন শাড়ী চাদর গামছা—আর বাচ্চা দুটো।

জীবন ভেবেছিল খুব ভোরে বেরিয়ে পড়বে মাল নিয়ে সরাসরি গিয়ে বৌটির স্বামীকে পাকড়াও করে কাপড়ের বাকী দামটা আদায় করে ছাড়বে।

কিন্তু সবদিক দিয়ে শত্রুতাই যদি না করবে তবে আর বর্ষাকাল কিসের!

কে জানে সারাদিনে আজ এ বৃষ্টি ধরবে কিনা?

বীণা গোমড়া মুখে বলে, এর মধ্যে কি করে কাজে যাই? কামাই করলে গিন্নী আবার ক্ষেপে যায়!

বীণার গায়ের রঙ শ্যাম, হাজায় হাজায় হাত আর পায়ের অঙ্গুলগুলি সাদা হয়ে গেছে। দেখলে মনে হয় হাতে পায়ে বুঝি মরণ-দশার পচন ধরেছে।

জীবন বলে, গিন্নী ক্ষেপে যান যাবেন, বর্ষা হলে মানুষ করবে কি?

চৌকিতে গুছিয়ে রাখা নতুন শাড়ীগুলির দিকে চেয়ে বীণা বলে, তুমি তো বলে খালাস. গিন্নী এদিকে এবার পূজোয় কাপড় না দেবার ফিকিরে আছে। পরশু একবেলা কামাই করলাম, তাতেই শাসিয়ে দিয়েছে—কামাই করলে পূজোর কাপড় পাবে না বাছা, বলে রাখলাম।

ঃ না দেয় না দেবে। আমরা ভিখিরি নই।

ঃ ভিখিরি কিসের? সব ঝি পায়। সারা বছর কাজ করলেই দু'খানা কাপড় দিতে হবে।

জীবন মৃদু হেসে বলে, এতো আগের নিয়ম গো, এবার ক'জনে পায় দেখো। নিয়ম বলে কিছু আছে দেশে? নইলে লেখাপড়া শিখে গামছা ফিরি করি, তোমায় ঝিগিরি করতে হয়?

বীণা নিশ্বাস ফেলে বলে, জানো, মাগী টের পেয়েছে তুমি আমায় অন্য বাড়ী খাটতে দেবে না। নইলে এত তেজ দেখাতে সাহস পেত না। অন্য ঝিরা কথায় কথায় কাজ ছাড়ছে, আজ এ বাড়ী কাল ও বাড়ী করছে।

মূক আবেদনের ভঙ্গিতে বীণা চেয়ে থাকে। কিন্তু জীবনের কাছ

থেকে কোন সাড়া-শব্দ মেলে না। অন্ত ঝিদের মত এ বাড়ী ও বাড়ী কাজ করে বেড়াবার অনুমতি সে বীণাকে দিতে পারবে না। ঘরের কাছে হারাধনবাবুর বাড়ী, বুড়ো হারাধন ছাড়া দ্বিতীয় পুরুষ নেই। বৌকে এখানে কাজ করতে দিতে হয়েছে তাই যথেষ্ট। তাকে পুরোপুরি ঝি বানিয়ে আর কাজ নেই।

অঘোরের আট বছরের ছেলে ভোলা এসে বলে, বাবা একটা বড় গামছা চাইল। মাসকাবারে দাম দেবে।

ঃ ধারে দিতে পারব না।

ভোলা ফিরে যায়। আবার এসে গামছার দামটা জিজ্ঞাসা করে যায়। তারপর কোমরে ছেঁড়া বিছানার চাদর জড়িয়ে অঘোর নিজেই আসে।

বলে, জানো হে জীবন, বন্ধুর দোকানে চিরকাল বাকীতে গামছা কিনেছি। আজ বিপাকে পড়ে তোমার কাছে নগদ দামে কিনতে হল। গামছা পর্যন্ত চুরি যায়, অ্যাঁ? তাও একমাসের ওপর ব্যবহার করেছি?

ঃ চুরি গেছে?

ঃ তবে কি? কাজে যাবার একটি কাপড় সম্বল, গামছা পরে নাইতে যাই। কে মেরে দিয়েছে কে জানে! আমার গামছা ব্যবহার করে তোরও যেন গেঁটে বাত হয় বাবা! ভাবলাম, দুত্তেরি, ন্যাংটো হয়েই নাইতে যাই! তা কেমন লজ্জা করতে লাগল!

অঘোর ফোকলা মুখে হ্যা হ্যা করে হাসে।

ঃ আপনার লুঙ্গিটা কি হল?

ঃ সেটাও চুরিই গেছে বলতে পার। ঘরের মানুষ চুরি করেছে এই যা তফাৎ। লুঙ্গিটা কি জান ভায়া, ইস্তিরির লজ্জা নিবারণ করছে।

ভাল একটা শাড়ী তোলা ছিল, বড্ড পাতলা, সেইটে পরতে হল—তা, বলে কি না লজ্জা করে। তোমার লুঙ্গিটা দাও, সায়ার মত পরব। এক মেয়ে পার করেছিস, আরেক মেয়ের বিয়ের বয়স হল, তোর অত লজ্জা কিসের? ওসব পাট চুকিয়ে দিলেই হয়! তা লজ্জাবতীরা মরলেও কি তা বুঝবে?

অঘোর আবার শব্দ করে হাসে। জীবনের শাড়ী কটার দিকে চেয়ে থেকে বলে, বাকী দিলে একটা শাড়ী নিতাম। তা, বাকী তো তুমি দেবে না ভায়া!

জীবন খানিক চুপ করে থেকে প্রশ্ন করে, আপিস থেকে ফিরে পরবেন কি?

ঃ গিন্নী যদি লুঙ্গিটা ফেরত দেন, সেটা পরব। নইলে তোমার এই গামছা। ততক্ষণে শুকিয়ে যাবে।

অঘোর চলে গেলে বীণা শুধোয়, ঘরে বসে কত রোজগার হল?

ঃ রোজগার কোথা হল? এক বাড়ীতে থাকি, পড়তা দামেই দিতে হল।

ঃ অ কপাল! আমি ভাবলাম ঘরে বসে বউনি হল, বিষ্টিটা আজ ধরলে হয়। আজ বেরোলে সব মাল বিকিয়ে যাবে।

জলের ফোঁটা বাঁচিয়ে উনানটা পাতা হয়েছে। পুঁই শাক কুটতে বসে নিজের গাটা একেবারে বাঁচাতে পারেনি, টপ টপ করে বাঁ কাঁধে জল পড়েছে।

এবেলা শুধু পুঁই শাকের চচ্চড়ি। বাড়ীতে ডাল নেই এক দানা। হাত একেবারে শূন্য নয় জীবনের। ক'দিনের মাল বেচার টাকা বাক্সে জমা আছে। টাকা আছে কিন্তু ডাল ও তরকারী এমন ভাবে একটু বেশী কেনার উপায় নেই যাতে আকাশ ভেঙ্গে বর্ষা

নামলে একটা বেলা চলে যায়।

ওই টাকায় মাল কিনতে হবে।

টাকা আছে—খরচ করা যায় না। এ অবস্থায় এযে কি অসহ্য সংযম মানুষের, জীবন ছাড়া কে বুঝবে!

দুপুরে বৃষ্টি থামে। মেঘ সরে গিয়ে বেরিয়ে আসে নীল আকাশ। রোদ ওঠে কড়া।

জীবন বেরোবার জন্য তৈরী হয়। বীণা বলে, ভাতের হাঁড়ির দামটা রেখে যাও। আজ দাম না পেলে গাল দিয়ে যাবে।

হাঁড়ির দামটা তার হাতে দেবার সময় জীবন ভাবে, সেও যদি বাকী টাকার জন্য গাল দিতে পারত ওই বৌটিকে!

কাঁধে পশরা চাপিয়ে সে বেরিয়ে যাবে, অঘোরকে জামা পরে ঘর থেকে বার হতে দেখে জিজ্ঞাসা করে, আপিস যাননি দাদা?

ঃ যা বিষ্টি, কি করে যাই বল?

অঘোরের তবে ভাল আপিস, বৃষ্টির দোহাই মানে!

ঃ কোন্ দিকে যাবেন?

ঃ আপিসেই যাচ্ছি।

ফেরিওলাকে পাড়া বদলাতে হয় রোজ। একদিন যে পাড়াটা চষে, ক'দিন বাদ দিয়ে তবে আবার সে পাড়ায় আসতে হয়।

সকাল থেকে বৃষ্টির কৃপায় বিশ্রাম পেয়েছে, জীবন পা-চালিয়ে দেয় দূরের সব চেয়ে ঘনবদ্ধ পাড়ার দিকে। ওখান থেকে বাজার খানিকটা কাছে হয়, কিন্তু সেজন্য কিছু আসে যায় না। মেয়েরা কাপড় গামছা কিনতে দোকানে যায় বটে আজকাল, এ এলাকার মেয়েরা কমই যায়।

বসতি খুব ঘন, গাদাগাদি করা মধ্যবিত্তের অনেকগুলি অন্তপুর।

হাঁক শুনে এক দোতলা বাড়ী থেকে জীবনকে ডেকে চার পাঁচটি মেয়ে বৌ কাপড় দেখছে, বাইরে আরেক জনের হাঁক শোনা যায়ঃ ছিট্ কাপড়—সায়া ব্লাউজ চাই। তাকেও ডেকে আনে মেয়েরা। কাঁধে ছিটের থান আর পিঠে সায়া ব্লাউজ ফ্রকের পুঁটলি নিয়ে আপিসের কেরাণী অঘোরকে ফেরিওলাদের দুপুর বেলার আসরে নামতে দেখে জীবন হাঁ করে চেয়ে থাকে।

অঘোর হেসে বলে, অবাক হয়ে গেছ ভায়া? বলব'খন সব বলব'খন।

দু'জনেরি বিক্রি হয়। জীবনের লাল কালো পাড়ের শাড়ীটা কিনে নেয় মাঝবয়সী একটি বৌ, ভালই লাভ থাকে জীবনের। অঘোর বেচে দুটি ব্লাউজ। তার রকমসকম দেখে বেশ বোঝা যায়, আজকেই সে হঠাৎ ফিরি করতে নামেনি। সেও পাকা ফেরিওলা।

একসাথে পথে নেমে অঘোর বলে, ক'মাস চাকরী গেছে। চাকরী জোটে না, কি করি, ভাবলাম তোমার রাস্তাই ধরি। বসে খেলে চলবে কেন?

ঃ তা গোপন করেছেন কেন? ফিরি করেন বলতে লজ্জা হয় নাকি দাদা?

ঃ লজ্জা না কচুপোড়া। যার পেট চলে না তার আবার লজ্জা! কি জান, মেয়েটার একটা সম্বন্ধ ঠিক হয়ে আছে। শ্রাবণের শেষ তারিখে বিয়ে। আপিসে কাজ করি জেনে মেয়েটাকে পছন্দ করেছে, জামা ফিরি করি শুনলে যদি পিছিয়ে যায়? এই ভয়ে ফাঁস করিনি কিছু। যাবার সময় বন্ধুর দোকানে মালপত্র রেখে যাব, ঘরে নিই না। তুমি যেন আবার পাঁচজনের কাছে ফাঁস করে দিও না ভায়া।

: জেনেও কি তা করতে পারি দাদা ?

: ভদ্দরলোক সেজে থেকেই মেয়েটাকে পার করি, তারপর দেখা যাবে। মেয়ের শ্বশুরবাড়ীর সামনে গিয়ে ছিট কাপড় সায়া ব্লাউজ হাঁকব।

দাঁড়িয়ে গল্প কয়ার সময় নেই। দু'জনেই দু'দিকে পা চালায়।

আরেকটা দিন শেষ হয়ে আসে। বর্ষাকালের আধখানা বৃষ্টিহীন দিন।

ঘরের দিকে পা বাড়ায় জীবন। শ্রান্তিতে শরীর ভেঙে এলেও একটু ঘুর পথ ধরে খানিকটা বেশী হাঁটতে হলেও অবসন্ন শরীরে সেই বৌটির বাড়ীতে একবার সে তাগিদ দিয়ে যাবে।

ওর স্বামী যদি কাজ থেকে ফিরে থাকে তবে তো কথাই নেই।

বারান্দার মাঝামাঝি বাড়ীর প্রধান দরজাটা খোলাই ছিল। বারান্দায় বসে সিগারেট টানছিল খালি গায়ে পা-জামা পরা একটি যুবক।

পাশের দিকের বন্ধ দরজাটা দেখিয়ে জীবন বলে, এ ঘরের বাবু আছেন ?

সে উদাসভাবে বলে, আছে বোধ হয়। ডেকে ছাখো।

কড়া নাড়তে দরজা খুলে উঁকি দেয় সেই ছোট মেয়েটি।

: তোমার বাবা ঘরে আছেন খুকী ?

: বাবা তো বেরোয়নি। বাবার জ্বর।

ভেতর থেকে পুরুষের গলা শোনা যায়, কেরে রাধি ?

: সেই কাপড়ওলাটা।

গায়ে একটা জীর্ণ সতরঞ্চি জড়িয়ে ভেতরের মানুষটা জীবনের সামনে এসে দাঁড়ায়। এলুমিনিয়ামের বাসনের সেই ফিরিওলাকে

রক্তবর্ণ চোখ নিয়ে সামনে দাঁড়াতে দেখে নিজের পাওনা টাকাটার বদলে প্রথমেই জীবনের মনে আসে এই কথা যে লোকটার খুব জ্বর, কয়েক দিনের মধ্যে বীণার কাছে হাঁড়ির দামটা সে চাইতে যেতে পারবে না।

সখি

সদরের কড়া নড়তে এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করে বিভা বলে, ছাখতো রিণা কে, কাদের চায়।

উপরে নীচে পাঁচঘর ভাড়াটে, ওপরে তিন নীচে দুই। বাইরে লোক এলে দরজা খুলে খোঁজ নেবার দায়িত্ব স্বভাবতই নীচের তলার ভাড়াটে তাদের উপর পড়েছে, বিভা এবং কল্যাণীদের। সদর থকে ভিজে সেঁতসেতে একরত্তি উঠানটুকু পর্য্যন্ত সরু প্যাসেজের এপাশের ঘরটা তাদের, ওপাশেরটা কল্যাণীদের। ভিতরে আরও একখানা করে ছোট ঘর তারা পেয়েছে—কিন্তু রান্নাঘর মোটে একটি। কল্যাণীরা রান্নাঘরের ভেতরে রাঁধে, বিভা রাঁধে বারান্দায়। কিন্তু সুবিধা অসুবিধার হিসাব ধরলে লাভটা কাদের হয়েছে ঠিক করা অসম্ভব। রান্নাঘরখানা ঘুপচি, আলোবাতাস খেলে না, উনান ধরলে একেবারে হাড় কাঁপানো দিনগুলি ছাড়া শীতকালেও ভাপসা গরমে বেশ কষ্ট হয়। নিশ্বাস আটকে আসে, মাঝে মাঝে ছুটে বেরিয়ে উঠানে দাঁড়িয়ে আকাশের ফালিটুকুর দিকে মুখ তুলে হাপ ছাড়তে হয়। বারান্দায় আবার জায়গা এই এতটুকু, নড়াচড়া করতেও অসুবিধা হয়।

সাধারণতঃ কল্যাণীরাই সদরের কড়া নাড়ায় বেশী সাড়া দেয়—তাড়াতাড়ি বেশ একটু আগ্রহের সঙ্গেই দেয়। বিভাদের বা উপরতলার ভাড়াটেদের কাছে লোকজন কদাচিৎ আসে, কল্যাণীরা নিজেরাও সংখ্যায় অনেক বেশী, দেখা করতে বেড়াতে বা কাজে বাইরের লোকও

ওদের কাছে বেশী আসে। অন্য ভাড়াটেদের তুলনায় বাইরের জগতের সঙ্গে ওদের বৃহত্তর যোগাযোগ।

আজ কল্যাণীদের সাড়া মেলে না। ওরা সম্ভবতঃ রান্নাঘরে খেতে বসেছে বা অন্য কাজে ব্যস্ত আছে। বিভার রান্না খাওয়ার পাট আগেই চুকে যায়। দু'এক মিনিট দেখে ওদের কাছেই লোক এসেছে ধরে নিয়েও শোয়া রিণাকে তুলে সে খবর দিতে পাঠিয়ে দেয়। এটুকু করতে হয় এক বাড়ীতে থাকলে।

ক্ষীণ অস্পষ্ট আশা কি জাগে বিভার মনে যে আজ হয়তো তার কাছেই কেউ এসেছে? কেউতো এক রকম আসেই না, যদিই বা কেউ আজ এসে থাকে!

একটু পরেই ফ্রক পরা তিন বছরের একটি মেয়ের হাত ধরে বিভার সমবয়সী একটি মেয়ে খোলা দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়।

ঃ ভাবতে পেরেছিলি? কেমন চমকে দিয়েছি।

তাকে দেখেই বিভা ধড়মড় করে উঠে বসেছিল, ব্যাকুল ও উৎসুক কণ্ঠে সে বলে, রাণী! ইস্, কি রোগা হয়ে গেছিস? কি চেহারা হয়েছে তোর?

রাণী যেন বেশ একটু ভড়কে যায়, মুখের হাসি খানিকটা মিলিয়ে আসে।—তা যদি বলিস তুইও কম রোগা হসনি। কালো হয়ে গেছিস যে, তোর অমন রঙ ছিল?

দুই সখি ব্যাকুল ও প্রায় খানিকটা ভীত ভাবে পরস্পরের সর্ব্বাঙ্গে চোখ বুলিয়ে দেখতে থাকে। দুজনেরি ভাঙাচোরা অতীতের প্রতিবিম্ব নিয়ে যেন দুটি আয়নার মত তারা পরস্পরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। এখন খারাপ হয়ে গেছে চেহারা, কত ময়লা হয়েছে রঙ, এমন ক্লিষ্ট হয়েছে চোখ? এতখানি উপে গেছে স্বাস্থ্যের জ্যোতি,

রূপলাবণ্য ? প্রতিদিন আয়নার সামনে তারা চুল বাঁধে, মুখে পাউডার সিঁথিতে সিঁদুর দেয়, নিজেকে রোগা আর ময়লা মনে হয়, কখনো একটু আপশোষ জাগে। কিন্তু আজ বন্ধুর চেহারা চেয়ে দেখার আগে পর্য্যন্ত তারা ধরতেও পারেনি ক'বছরে কি শোচনীয় পরিবর্ত্তন ঘটে গেছে নিজের নিজের দেহে, কি ভাবে শুকিয়ে সিঁটকে গেছে শরীর।

: আয় রাণী বোস। ক'টি হল ?

বিভা রাণীর মেয়ের হাত ধরে কোলে টেনে নেয়।

: কটি আবার ? এই একটি। তোর ?

কতকাল কেটেছে, ক'বছর ? কতকাল পরে দেখা গেল। এই তো সেদিন তাদের বিয়ে হল, যুদ্ধ বাধার পর একে একে দুজনেরি! বছর পাঁচেক কেটেছে তাদের শেষ দেখা হবার পর। পাঁচ বছরে একটি মেয়ে হয়েই রাণীর সেই আঁটো ছিপছিপে গড়ন, যা দেখে তার প্রতিদিন হিংসা হত, সে গড়ন ভেঙ্গে এমন চাঁচাছোলা প্যাকাটির মত বেঢপ হয়ে গেছে। কণ্ঠার হাড় উঁকি মারছে, চিবুকের ডৌল বুঝি আর খুঁজলেও মেলে না। অমন মিষ্টি কোমল ফরসা রঙ জলে ধোয়া কাটা মাছের মত কটকটে সাদা হয়ে গেছে।

বিভা ভাবে আর উতলা হয়, তার চোখে জল আসে।

বিভার দুটি ছেলেই ঘুমোচ্ছিল, ছোটটির দিকে কয়েক মুহূর্ত্ত চেয়ে থেকে রাণী মৃদুস্বরে বলে, ওর কত বয়স হল ?

: দু'বছর।

দুটি ছেলেই রোগা, ছোটটির পেট বড়, হাত-পা কাটির মত সরু। ওটিকে দেখতে দেখতে রাণী নিজের চেহারার কথা ভুলে গিয়েছিল। আচমকা সে বলে, কি আর করা যাবে, বেঁচে-বর্তে যে আছি তাই ঢের। যা দিনকাল পড়েছে।

ঃ সত্যি ! একেবারে শেষ করে দেবে।

বিভা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। সে ভুলে গিয়েছিল কি ভয়ঙ্কর দুর্দ্দিনের মধ্যে কি প্রাণান্তকর কষ্টে তারা বেঁচে আছে, ভুলে গিয়েছিল কি অবস্থায় কি খেয়ে কত দুশ্চিন্তা আর আতঙ্ক বুকে নিয়ে তারা দিন কাটায়। ছেলেবেলা থেকে শুনে শুনে আর অস্পষ্ট অনুভব করে করে মনের মধ্যে যে রহস্যময় ভীতিকর একটা চোরাবালির স্তর গড়ে উঠেছে, যার অতল বিষাদ আর হতাশায় মিছে মায়ার মত দু'দিনের জীবন যৌবন তলিয়ে যায়, সেটা আজ আলোড়িত হয়ে উঠেছিল। এই তবে জীবনের রীতিনীতি? এই তবে মানুষের বাঁধা-ধরা অদৃষ্ট, এত তাড়াতাড়ি তারুণ্য আনন্দ উৎসাহ সব শেষ হয়ে যায়? জীবনের এই চিরন্তন নিয়মেই সে আর বিভা জীবনটা সুরু করতে না করতে মাত্র পঁচিশ ছাব্বিশ বছর বয়সে এমন হয়ে গেছে? রাণী তাকে মনে পড়িয়ে দিয়েছে, না তা নয়! জীবন অত ফাঁকিবাজ নয় অমন ভঙ্গুর নয় দেহ। শুধু খেতে পরতে না পেয়ে, চিন্তায়-ভাবনায় জর্জ্জরিত হয়ে, হাসি-খুসী আমোদ আহ্লাদের অভাবে তাদের এই দশা।

ঃ একা এসেছিস রাণী?

ঃ একা কেন? ঘোড়ায় চেপেই এসেছি, দরজায় দাঁড়িয়ে আছে!

ঃ কি আশ্চর্য্য! তুই কি বল তো? এতক্ষণ বলতে নেই?

অসহায় ভাবে বিভা পরণের কাপড়খানার দিকে তাকায়। রাণী একখানা ভাল কাপড় পরে এসেছে, আগেকার দিনের সঞ্চিত তোরঙ্গে তোলা কাপড়ের একখানা, বিয়ে বাড়ীর মত বিশেষ উপলক্ষ্য ছাড়া কেউ যা পরে না, পরলে মানায়ও না। এ রহস্যের মানে বিভা জানে, তারও একই অবস্থা। আত্মীয় বন্ধুর বাড়ী যেতে, সিনেমা দেখতে

বেড়াতে বার হতে সাধারণ রকম ভাল কাপড় যা মানায় সেরকম কাপড় তার তোরঙ্গেও পাঁচসাত খানা ছিল, বাড়ীতে পরে পরে সে ভাণ্ডার শেষ হয়েছে। এ দুঃশাসনের দেশে তাদের কাপড় টানাটানির শেষ নেই।

বিয়ের সময়ের দামী শাড়ী আর ঘরে পরার শাড়ীর মাঝামাঝি কিছু নেই, রাখা অসম্ভব। ঘরেও তো উলঙ্গ হয়ে থাকতে পারে না মেয়ে মানুষ? ইতিমধ্যে মরিয়া হয়ে চোখ কান বুজে সাধারণ সামাজিকতা রাখার জন্য সাধারণ রকম ভাল দু'একখানা কাপড় সে কিনেছে, প্রাণপণে চেষ্টা করেছে ওই প্রয়োজন ছাড়া ব্যবহার না করতে কিন্তু সম্ভব হয় নি। চব্বিশ ঘণ্টা দেহ ঢাকতে হয়, বাসি কাপড় ছাড়তে হয়, স্নান করে ধুতে হয়, সাবান কেচে ধোপ দিয়ে ধোয়াতে হয়—নিত্যকার এই চলতি প্রয়োজনের দাবী সবচেয়ে কঠোর। তাই ভাবতে হয়েছে, এখনকার মত প'রে ক'টা দিন চালিয়ে দিই, উপায় কি, ধোপ দিয়ে এনে তুলে রাখব। ধুইয়ে এনে সত্যই বাক্সে তুলে রেখেছে কিন্তু বেশীদিন তুলে রাখা যায় নি।

আলনার শাড়ী দু'খানার একটি পরণের খানার মতই ছেঁড়া, অন্যটি বড় বেশী ময়লা। বাক্স কি খোলা যায়? রাণীর স্বামী সদর দরজায় দাঁড়িয়ে আছে, এখন কি অত সমারোহ করা চলে? হাত বাড়িয়ে সে ময়লা কাপড় খানাই টেনে নেয়।

কল্যাণী অমিয়কে জিজ্ঞাসা করছিল, কাকে চান?

কল্যাণী বিভার চেয়ে দশ বছরের বড় হবে, তার বেশী নয়। তার দুটি ছেলে মেয়ে, সংসারে এগারজন লোক। সেই চাপে তার লজ্জাসরম মুড়িয়ে গেছে। আঁচিয়ে উঠে সদরে মানুষ দেখে এক কাপড়ে সে অনায়াসে তার প্রয়োজন জানতে এসেছে, তার সঙ্কোচ

নেই দ্বিধা নেই অস্বস্তি নেই। দাসীর মত দেখায় না রাণীর মত দেখায়, বাইরের অজানা লোকের চোখে তাকে কতখানি লজ্জাহীন ঠেকে এ চিন্তার অঙ্কুরও বুঝি আর গজায় না তার মনে, এমন শক্ত অনুর্ব্বর হয়ে গেছে তার মধ্যবিত্তের নরম মন।

কিন্তু কি ভয়ানক কথা, নিজেও বিভা যে এগিয়ে এসেছে গায়ে ব্লাউজ না চাপিয়েই! এটা তারও খেয়াল হয় নি। তাড়াতাড়ি ছিঁড়ে যায় বলে দশটা নাগাদ বাড়ীর পুরুষরা আপিসে কাজে বেরিয়ে গেলেই সে ব্লাউজ খুলে ফেলে, বিকালে পুরুষদের ফেরার আগে আবার গায়ে দেয়। খালি গায়ে থাকাটা কি তারও অভ্যাস হয়ে গেল কল্যাণীর মত? দাসী চাকরাণী মজুরাণীর মত?

কান দু'টি গরম হয়ে ওঠে বিভার।

কিন্তু সামনে যখন এসেই দাঁড়িয়েছে, লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে থাকা আরও বিশ্রী হবে।

কল্যাণীকে সে জানায়, ইনি আমাদের এখানে এসেছেন। সেই যে রাণীর কথা বলেছি আপনাকে, আমার ছেলেবেলার বন্ধু? ইনি তার স্বামী।

আপনার অসুখ নাকি? কল্যাণী বিনা ভূমিকায় প্রশ্ন করে।

অসুখে পড়েছিলাম, এখন সেরে উঠেছি।

কল্যাণী বোধ হয় কথাটা বিশ্বাস করে না। অমিয়র চেহারায় সেরে ওঠার লক্ষণ খুঁজে পাওয়া সত্যই কঠিন। কোন রোগ সেরে গেলে এরকম চেহারা হয় না মানুষের, রোগ বজায় থাকলেই হয়। কালিপড়া চোখে শুধু তার দৃষ্টিটা উজ্জ্বল, ঝকঝকে।

ওঃ মনে পড়েছে, কল্যাণী আচমকা বলে, আপনারি গুলি লেগেছিল। কাগজে পড়ে বিভা বলেছিল আপনার কথা।

এতবড় কথাটা ভুলে যাবার জন্য কল্যাণী অপরাধীর মত হাসে।

অসুখও হয়েছিল।—অমিয় বলে।

দশ মিনিটের বেশী অমিয় বসে না। কাজে যাবার পথে সে রাণীকে শুধু পৌঁছে দিতে এসেছে। বেচারীর গুলিও লেগেছে, সরকারী দপ্তরের চাকরীটিও গেছে। বন্ধুরা একটি কাগজে মোটামুটি একটা কাজ জুটিয়ে দিয়েছে। ঘটনাচক্রে কাগজটি আবার সরকার-বিরোধী, কাগজটাই কবে বন্ধ হয়ে যায় ঠিক নেই।

কিন্তু অমিয়কে বিশেষ শঙ্কিত মনে হল না। বরং কেমন যেন একটা বেপরোয়া ভাব এসেছে।

সে বিভাকে বলে, কি জানেন, সব উনিশ আর বিশ। ও ছাতার চাকরী থেকেই বা কি এমন স্বর্গলাভ হচ্ছিল? ঘরে বাইরে চাকরীর মর্য্যাদা রাখতে প্রাণ যায় যায় অবস্থা। নিজের মনটাও মানে না, যেমন হোক চাকরী তো করি, মাস গেলে মাইনে তো পাই যাহোক, একদম মিনিমাম ভদ্রলোকের ষ্ট্যাণ্ডার্ড তো অন্ততঃ রাখতে হবে? সে এক ছুঁচো গেলার অবস্থা, পেটও ভরতে পারি না, না খেয়ে মরতেও পারি না! এখন শালা বেশ আছি, হয় এস্পার নয় ওস্পার, ব্যাস্!

অনায়াসে কিছুমাত্র দ্বিধা সঙ্কোচ না করে সে বিভার সামনে শালা শব্দটা উচ্চারণ করে। সত্যই করে। কি ছোটলোক হয়ে গেছে শিক্ষিত মার্জ্জিত ভদ্র সন্তান! পাশে কোথায় রেডিয়োতে মিষ্টি অলস সুরে গান বাজছে, উঠানে এঁটো বাসনের ঝনঝনানি। কল্যাণীদের সঙ্গে দোতালার এঁটো বাসনও উঠোনে এসে জড়ো হচ্ছে। একসঙ্গে ছোট ছেলেমেয়ে কাঁদছে তিনটে অথবা চারটে, সংখ্যাটা ঠিক ধরা যায় না।

অমিয়র কথাবার্তায় যেন শুধু ওই বাসনের ঝন্‌ঝনানি এসেছে, মিহি মিঠে সুরটা গেছে উধাও হয়ে।

উঠে দাঁড়িয়ে অমিয় বলে, আপনার চিঠি পাবার পর থেকে বাড়ী বয়ে এসে ঝগড়া করার জন্য কোমর এঁটে বসেছিল, আমার অসুখের জন্য দেরী হয়ে গেল।

কিসের ঝগড়া?

বলেনি? চিঠিটা পড়ে কেবলি বলত, দেখলে? ছেলেবেলার বন্ধু, কত ভাব ছিল, কাগজে গুলি লাগার খবর পড়ে একটা চিঠি লিখে দায় সেরেছে! কর্ত্তাটিকে পাঠিয়েও তো খবর নিতে পারত?

ওঃ, এই ঝগড়া!—বিভা সত্যই বিব্রত বোধ করে—যাব মনে করেছিলাম। ওঁকে তাগিদ দিয়েছি, একমাসের ওপর যাব যাব করেছেন—

কিন্তু যেতে পারেন নি।—কোটরে বসা চোখের উজ্জ্বল দৃষ্টিতে সোজা বিভার মুখের দিকে তাকিয়ে দশ মিনিটে গড়া আশ্চর্য্য অন্তরঙ্গতায় মুখের কথা কেড়ে নিয়ে অমিয় সহজ সহানুভূতির সায় জানিয়ে বলে, আপিস, ছেলে পড়ানো, বাজার, রেশন কয়লা ওষুধ ডাক্তার—কি করেই বা পারবেন?

ওঁর এখনো ছুঁচো গেলা অবস্থা।—বিভা প্রাণ খুলে হাসে।

অমিয় চলে গেলে বিভা সহজ ভাবে বলে, নে, কাপড়টা ছেড়ে হাত পা এলিয়ে বোস, সং সেজে থাকতে হবে না।

সত্য কথা বলতে কি, রাণীকে এতক্ষণ সে প্রাণ খুলে গ্রহণ করতে পারে নি, ভিতরে একটা আড়ষ্টভাব বজায় থেকে গিয়েছিল। খুসী হলেও সে আনন্দে খাদ ছিল। হোক সে ছেলেবেলার সখি,

মাঝখানে অনেক ওলোট পালোট হয়ে গেছে চারিদিকে ও তার নিজের জীবনে, কে বলতে পারে তাকে কিরকম দেখবে কল্পনা করে এসেছে রাণী, তার কাছে কিরকম ব্যবহার আগে থেকে মনে মনে চেয়ে এসেছে? হয় তো অনেক কিছু অন্যরকম দেখে তার ভাল লাগছে না—হয় তো সে ভুল বুঝছে তার কথা ও ব্যবহার, আরও হয়তো ভুল বুঝবে! এই একখানা আর পাশের আধখানা নিয়ে দেড়খানা ঘরে কতদিকে যে বিষিয়ে গেছে জীবনটা সে নিজেই কি খানিক জানে না। রাণী এসে দাঁড়ানো মাত্র তার ফ্যাকাসে ম্লান চেহারা দেখে উতলা হওয়ার সঙ্গে প্রাণটা তার ধক্ করে উঠেছিল বিপদের আশঙ্কায়! তার সখি এসেছে, দিনে অন্ততঃ একবার যাকে কাছে না পেলে সে অস্থির হয়ে পড়ত এতদিন পরে সেই সখি এসেছে তার ঘরের দরজায়—আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওকে তো সে অভ্যর্থনা করতে পারবে না, হেসে কেঁদে অনর্গল আবোল তাবোল কথা যা মনে আসে বলে গিয়ে প্রমাণ দিতে পারবে না সে কৃতার্থ হয়েছে। সে সাধ্য তার নেই, হাজার চেষ্টা করেও বেশীক্ষণ সে আনন্দোচ্ছ্বাস বজায় রাখতে পারবে না, ঝিমিয়ে মিইয়ে তাকে যেতেই হবে। কি ভাববে তখন রাণী? কি বিশ্রী অবস্থা সৃষ্টি হবে?

আরও ভেবেছিল: বিকাল পর্য্যন্ত যদি থাকে; চায়ের সঙ্গে ওকে কি খেতে দেব? ওর হাই উঠে, বিছানায় কি পেতে দিয়ে ওকে আমি শুতে দেব?

দশ মিনিটের মধ্যে অমিয় তাদের সখিত্বকে সহজ করে বাস্তবের দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে গেছে। বিভার আর কোন ভয় নেই, ভাবনা নেই, সঙ্কোচও নেই। কারণ, কোন অভাব কোন অব্যবস্থার জন্য রাণী তাকে দায়ী করবে না, তার মেয়ে দুধের

খিদেয় কাঁদলে সে যদি শুকনো দুটি মুড়ি শুধু তাকে খেতে দেয়, তাতেও নয়। চাদরের বদলে ময়লা ন্যাকড়া পেতে দিলেও তাতে পা এলিয়ে রাণী তাকে গাল দেবে না মনে মনে।

এটুকু অমিয় তাকে বুঝিয়ে দিয়ে গেছে।

ময়লা শাড়ীখানা পরে রাণীও যেন বাঁচে।

একটা পান দে না বিভা ?

কোথা পাব পান ? ত্যাগ করেছি। মাসে তিন চার টাকা খরচ—কি হয় পান খেয়ে ? একটি লবঙ্গ মুখে দিলে মুখশুদ্ধি হয়। নে।

বিভার বাড়ানো হাতে প্ল্যাসটিক্‌সের চুড়ি নজর করে রাণী হাসে। তুইও ধরেছিস ? ভাগ্যে এ ফ্যাসনটা চালু হচ্ছে—সোনা না দেখে লোকে কিছু ভাবে না।

ফ্যাসন কি এমনি চালু হয় ? যেমন অবস্থা, তেমনি ফ্যাসন। সোনা নেই তোর ?

টুকটাক আছে। তোর ?

চারগাছা চুড়ি, সরু হারটা আর কানপাশা। ও বছর টাইফয়েডের এক পালা গেল, তারপর আমার কপাল টানল হাসপাতালে। মরবে জেনেও কেন যে পেটে আসে বুঝি না ভাই। আমাকেও প্রায় মেরেছিল, কি যে কষ্ট পেলাম এবার। অথচ ছাখ, এ দুটোর বেলা ভাল করে টেরও পাই নি। দিন কাল খারাপ পড়লে কি মানুষের বিয়োনোর কষ্টও বাড়ে ?

বাড়ে না ? খেতে পাবে না, মনে শান্তি থাকবে না, গায়ে পুষ্টি হবে না, বিয়োলেই হল ?

দুই সখি অদ্ভুত এক জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে চোখে চোখে তাকায়,

দু'জনের মনে এক সঙ্গে একই অভিজ্ঞতা একই সমস্যা জেগেছে, আজ দু'জনের নিরিবিলি দুপুরে কাছাকাছি আসার সুযোগে পরস্পরের কাছে প্রশ্নটা তাদের যাচাই করে নিতেই হবে। জানতে হবে, খাপছাড়া অদ্ভুত একটা ফাঁদে পড়ার যে রহস্যময় ব্যাপারটা নিয়ে যন্ত্রণার অন্ত নেই, সেটা শুধু একজনের বেলাই ঘটেছে, না দু'জনেরই সমান অবস্থা। বুঝতে হবে কেন এমন হয়, এমন অঘটনের মানে কি?

রাণী বলে, বল্ না? তুই আগে বল।

আগেও ঠিক এমনি ভাবেই জীবনের গহন গভীর রহস্যের কথা উঠত, কেউ একজন মুখ খোলার আগে চোখ মুখের ভাবভঙ্গি দেখেই দুজনে টের পেত যে এখন জগতের সমস্ত মানুষের কাছ থেকে আড়াল করা শুধু তাদের দুই সখির প্রাণের কথা বলাবলি হবে!

বিভা বলে, কিছু বুঝতে পারি না ভাই। এরকম যাচ্ছেতাই শরীর, কি যে খারাপ লাগে বলার নয়, তবু আমার যেন বেশী করে ভূত চেপেছে। বিয়ের পর দু'এক বছর সবারি পাগলামি আসে। ও বাবা, এখন যা দাঁড়িয়েছে তাতে তখন রীতিমত সংযমী ছিলাম বলা চলে। আগে ভাবতাম ও-বেচারীর দোষ। ঝগড়া করে ওদিকের ঘুপচির মধ্যে বিছানা করে শুয়েছিলাম, তখন টের পেলাম কি বিপদ, আমারও দেখি মরণ নেই। ঘুম আসবে ছাই, উঠে এসে যদি ডাকে ভেবে কি ছটফটানি আমার। বিশ্বাস করবি? থাকতে না পেরে শেষে নিজেই এলাম।

রাণী একটু হাসে, বলেছিলি তো যে একা শুতে ভয় করছে, না?

তোরও তবে ওই রকম?—বিভা যেন স্বস্তি পায়।

কি তবে? তোর একরকম আমার অন্য রকম?

দুই সখি আশ্চর্য্য হয়ে পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

রাণী বলে, তবে আমার আজকাল কেটে গেছে, অন্য দিকে মন দিতে হয়। তোরও কেটে যাবে।

একটু ভেবে রাণী আবার বলে, আমার মনে হয় এ একটা ব্যারাম। ভাল খেতে পরতে না পেলে ভাবনায় চিন্তায় কাহিল হলে এরকম হয়। ছেলেপিলেকে দেখিস না পেটের ব্যারাম হলে বেশী খাই খাই করে, চুরি করে যা তা খায়?

চুরি করেও খাস না কি তুই?

দুই সখি হেসে ওঠে।

সেই এক মুহূর্ত্তের হাসির ক্ষীণ শব্দ সঙ্গে সঙ্গে কোথায় মিলিয়ে যায় শিশুর কান্না আর বাসন নাড়ার শব্দ মেশানো দুপুরের স্তব্ধতায়। শুধু শিশুর কান্না নয়, এ বাড়ীর দোতালাতেই মেয়েলি গলায় একজন সুর করে কাঁদছে। ওপরতলার একজন ভাড়াটে রমেশ, তার বুড়ি মা। রমেশের ছোট ভাই অশেষ, সবে কলেজ থেকে বেরিয়ে চাকরীর ধান্ধায় ঘুরতে সুরু করেছিল, ক'দিন আগে টি-বি রোগে সে মারা গেছে।

এই সেদিন দেখেছি চলাফেরা করছে—বিভা হঠাৎ শিউরে উঠে বলে—দিনরাত ঘুরে বেড়াত। ওঁর সঙ্গে তর্ক করত আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি কি না। এই বিছানায় বসে একদিন রাত্রে কথা কইতে কইতে কাসতে সুরু করল, এক ঝলক রক্ত উঠে চাদরে পড়ল। কিরকম ভ্যাবাচেকা খেয়ে যে চেয়ে রইল ছেলেটা। আগে একটু আধটু রক্ত পড়েছে, গ্রাহ্যও করেনি, সেদিন প্রথম বেশী পড়ল। নিজের শরীরটাকে পর্য্যন্ত গ্রাহ্য করে না, কি যে হয়েছে আজকালকার ছেলেদের—

আনমনে কি যেন ভাবে, একটু ম্লান হেসে বলে, প্রথমে ঠিক হয়েছিল চাদ্দরটা পুড়িয়েই ফেলব। কিন্তু তা'হলে সঙ্গে সঙ্গে আবার একটা চাদর কিনতে হয়। শেষ পর্য্যন্ত তাই—

এ কথাটাও বিভা শেষ পর্য্যন্ত বলে উঠতে পারে না, আবার আনমনা হয়ে যায়।

কি ভাবি জানিস রাণী? শুধু শাকপাতা আর পচা চালের দুমুঠো ভাত খায়, না এক ফোঁটা দুধ না একটু মাছ। এই খেয়ে আপিস করা, রাত ন'টা পর্য্যন্ত ছেলে পড়ানো। একদিন যদি ওইরকম কথা কইতে কইতে কাসতে সুরু করে আর—

এ কথারও শেষটা মুখে উচ্চারণ করা অসম্ভব।

রাণী অসম্ভবকে সম্ভব করে যোগ দেয়,—কাসতে সুরু করে আর রক্তে বিছানা লাল হয়ে যায়? আমিও আগে এরকম আবোল তাবোল কত কি ভাবতাম। রক্তে একদিন রাস্তাই লাল হয়ে গেল। আর ভাবি না। কি আছে অত ভয় পাবার, ভাবনা করার? সংসারে কুলি মজুরও তো বেঁচে আছে, বেঁচে থাকবে।

সংঘাত

বিন্দের মা তার খড়ের ঘরের সামনের সরু বারান্দাটুকুর ঘেরা দিকে তাদের আশ্রয় দিয়েছিল।

ঘরে ঢুকবার দরজা বারান্দার মাঝামাঝি, তার এদিকের অংশটা ঘেরা, ওদিকটা ফাঁকা। চালাটা বারান্দার উপরে নেমে এসেছে, কোমর বাঁকিয়ে নীচু হয়ে বারান্দায় উঠতে হয়।

তিন হাত চওড়া ও হাত পাঁচেক লম্বা হবে ঘেরা অংশটুকু বারান্দার—তার ভাড়া দু'টাকা। বাচ্চাটাকে ধরে তারা তিনটি মোটে প্রাণী, তাদের নড়তে চড়তে কষ্ট হয়।

বিন্দের মা তাদের আশ্রয় দিয়ে বলেছিল, এখন এমনি থাকো। কাজকর্ম্ম জুটিয়ে নাও, তারপর দু'টাকা ভাড়া দিও। মাসে দু'টাকার বেশী চাইব না আমি।

গাছতলা ছাড়া গতি ছিল না তখন তাদের। কত ভাল লেগেছিল বিন্দের মার কথাগুলি!

দু'বাড়ীতে বিন্দের মা শৈলর কাজ জুটিয়ে দিয়েছে। কত ভাল মানুষ মনে হয়েছে তাকে!

মাস কাবারে বেতন পেয়ে আজ এই আঁধার ঘুপচিটুকুর জন্যে দুটো টাকা দিতে কিন্তু গাটা চড়চড় করে শৈলর। ছেলে কোলে দু'বাড়ীতে খেটে কত কষ্টে রোজগার করা ক'টা টাকা!

জীবনে নিজে খেটে প্রথম রোজগার।

মাখনের এখনো কাজ জোটে নি। এই সামান্য টাকা থেকে ঘর ভাড়া দিলে তারা খাবে কি ?

শৈল বলে, মানুষটা একটা কাম জুটাইয়া নিক, তারপর থেইকা ভাড়া নিও। কয়টা টাকা পাইছি, ভাড়া দিলে থাকব কি ?

বিন্দের মা গালে হাত দিয়ে বলে, কাজ না জুটিয়ে দিলে ও টাকাও পেতি ? দু'টো টাকা ভাড়া দেবে তার বায়না কত !

চাষীর মেয়ে শৈল ফোঁস করে ওঠে, বায়না কিসের ? ভাড়া দিমুনা কইছি ! দাও, টাকা মিটাইয়া দাও।

মাইনে এনে মাখনের হাতে তুলে দিতে হয়েছে শৈলকে। সে স্বামী, তারও মালিক, তার রোজগারেরও মালিক। টাকা হাতে নিয়ে গুণে দেখে চোখ পাকিয়ে মাখন বলেছিল, টাকা লুকাইছস্ ? বড় দালানে বার টাকা না ? বাইর কর তিনটাকা।

মরণ আমার ! কবে কামে লাগছি খেয়াল আছে ?

তা বটে। ও বাড়ীতে পুরো মাসের মাইনে শৈলর পাওয়ার কথা নয় !

মাখন দু'টো এক টাকার নোট ছুড়ে দেয় বিন্দের মার দিকে, নোট দুটো ফরফর করে উড়ে মাটিতে পড়ে।

কুড়িয়ে নিয়ে চোখ পাকিয়ে তাঁদের দিকে তাকায় বিন্দের মা। পেট ভরে খেতে জোটে না, দয়া করে থাকতে দিয়েছি, তেজ কত। তবু যদি মিনসের নিজের রোজগার হত, বৌয়ের ঝি-গিরির টাকায় ঘরে বসে না খেত।

চাল ঝাড়ার বাড়তি কাজ করে শৈল কিছু খুদ এনেছে। মাখন বলে, খুদ থুইয়া দে। এক সের চাল আর কিছু মাছ নিয়া আসি। কতকাল মাছ খাই না !

আলাপাথারি খরচ কইরো না।

কাইল পরশু ওই ঘরের বেতন পাবি না?

সারাডা মাস চালান লাগবো না?

মাখন নির্ব্বিচারে হেসে বলে, তুই ভাবছস কি? আমি কাম করুম না? খাইটা খামু, ডর কিসের!

শৈলের একখানা শাড়ী দু'খণ্ড করে সে লুঙ্গির মত পরে। কাঁধে ময়লা দুর্গন্ধ গামছা। শৈলর মোটে একখানি কাপড় সম্বল, সারাদিন পরে, লোকের বাড়ী কাজ করে, রাঁধে বাড়ে—সবই করে। রাত্রে শোবার আগে গা ধুয়ে ছেঁড়া ন্যাকড়া গায়ে জড়িয়ে কাপড়খানা কেচে মেলে দেয়।

মাটির একটা হাঁড়ি আর ছোট একটি কড়াই ছাড়া বাসনপত্র কিছুই নেই। একটা উনান পর্য্যন্ত নেই। কাজ সেরে এসে বিন্দের মা'র রান্না শেষ হলে তার উনানে ভাত বা খুদ সিদ্ধ করে নিতে হয়। কিছু কয়লা ধার হয়েছে।

আর কিছু হোক বা না হোক চলনসই একটা ঘর, দু'টো বাসন, নিজেদের একটা উনান— পেটের চিন্তাই সবার উপরে উঠে আছে। পূজার সময় দু'বাড়ী থেকে সে দু'খানা শাড়ী পাবে—সে পর্য্যন্ত নয় এভাবেই চালিয়ে যাবে কোন মতে। কিন্তু কি দুরন্ত কি ভয়ানক এই পেটের খিদে!

বিন্দের মা এতকটি ভাত খায় ভাজা ব্যাঞ্জন দিয়ে আর হাঁ করে সহরে নবাগতদের দুটি কাঁচা লঙ্কা দিয়ে এক কাঁড়ি ভাত কোঁৎ কোঁৎ করে গিলে ফেলার কসরৎ চেয়ে ত্মাখে!

রেশনের চাল আনে—দু'দিনে তিন বার চার বার করে খেয়ে শেষ করে দেয়! আটা কোনখান দিয়ে কি ভাবে শেষ হয়ে যায়

টের পায় না। তারপর চলে এবেলা আধপেটা, ও বেলা সিকি-পেটা সে বেলা উপোস—চাল ধার করার চেষ্টা এবং শৈলর বাড়তি কাজ করে আনা খুদটুকু চালটুকু দিয়ে কোন রকমে দিন কাটানো।

বিন্দের মা অন্যদের কাছে বলে, ছি ছি রাম রাম। মাগো মা, এমন পেটুক, এমন বেহিসেবী! আর কি নোংরা বাবা, মদ্দমাগী কেউ কি খাট করে কাপড় ছাড়বে? ছাড়বে কি, থাকলে তো ছাড়বে। সম্বল তো ওই পরণের ন্যাকড়াটুকু।

হাড্ডিসার পেট মোটা পাঁচ বছরের বাচ্চাটা এখনো মাই খায়। ওকে ছাড়া একদণ্ডে জগৎ অন্ধকার হয়ে আসে শৈলর, তবুও ওর জন্যই প্রাণ তার অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। ওকে নিয়ে কাজে যেতে হয়, ঘর ধোয়া বাসন মাজা উনান নিকানো সব কাজ করতে করতে সর্ব্বদা ওকে সামলাতে হয়। খাওয়াদাওয়ার সময় দূরে দাঁড়িয়ে নজর দিলে, ঘরে গেলে, বাড়ীর মানুষ বিরক্ত হয়, গজ গজ করে।

কড়া সুরে বলে, ওকে রেখে আসতে পার না? বড় নোংরা বাছা তোমার ছেলে। গায়ে প্যাঁচড়া, কানে ঘা,—ছেলেপিলের না ছোঁয়াচ লাগে।

মাখনের কাজ নেই কিন্তু বাচ্চাটাকে রাখতে সে রাজী নয়। বলে, তর পোলারে নিয়া থাকুম, কামের খোঁজে যামু না?

বাড়ী ফিরে শৈল ছাখে সে চিৎ হয়ে কাঁথায় শুয়ে আছে। শোনে বাড়ীর বাইরেও সে যায়নি একবারও।

ঝগড়া করলে মাখন মুখ খিচিয়ে বলে, হ, বুঝছি সব, তোর মতলব খারাপ। ক্যান পোলারে নিয়া কেউ কাম করে না? সুবিধা হয় না বুঝি পিরীত করনের?

পীরিত্তের একটা অশ্রাব্য বিশেষণের মুখে আগুন জেলে দিয়ে বাচ্চাটাকে দড়াম করে ফেলে শৈল মুখ খোলে। বিন্দের মা কান পেতে শোনে। অনেক কটু কথা শৈল বলে কিন্তু মাখন যে বসে বসে তার রোজগার খাচ্ছে এ-কথাটা একবার একটু ইঙ্গিতেও উল্লেখ করে না!

মাখন বলে যে জানে জানে, সে সব জানে। বিন্দের মা-ই তাকে বলে দিয়েছে খোকাকে তার সঙ্গে দিয়ে কাজে পাঠাতে, একলা তাকে কাজে যেতে বারণ করেছে।

বিন্দের মা সামনে এসে বলে, ওকথা তোকে কখন বললাম রে মুখপোড়া? ভাল চাইলে উনি মন্দ বোঝেন! আমি বললাম মায়ের ছেলে মায়ের সাথে থাকবে, কাজে যাক বা সে চুলোয় যাক—মরদ মানুষের কি ছেলে আগলে ঘরে বসে থাকলে চলে? কাজ খুঁজতে মন নেই, মোর নামে উল্টো গাইছেন!

মাখন চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে থাকে।

বিন্দের মা খনখনিয়ে বলে, চোখ রাঙাচ্ছে। আরে আমার ব্যাটাছেলে! বৌয়ের রোজগার বসে খায়, লজ্জাও নেই।

শৈল যে খোঁচাটা কখনো দেয় না, মাখনকে সেই খোঁচা দিয়ে বিন্দের মা যেন স্বস্তি পায়।

মাখন ফিরে আসে—চাল নিয়ে, তরকারী নিয়ে, শিশি ভরা তেল নিয়ে—দেড়-পো গলদা চিংড়ি নিয়ে।

ক্ষণেকের জন্য লোভাতুর দৃষ্টিতে চেয়ে শৈল চাঙ্গা হয়ে ওঠে, তারপর বিমর্ষ বিরস মুখে মাই ছাড়িয়ে ছেলেটাকে ঠেলে সরিয়ে দেয়।

কয় টাকার সওদা করছ?

তা দিয়া তর কাম কি?

বিন্দের মা একবার উঁকি দিতে এসে গালে হাত দিয়ে ফিরে যায়। তার রান্না শেষ হলে তোলা উনানটি বারান্দায় এনে দুটি কয়লা দিয়ে গোমড়া মুখে শৈল নিজের রান্না সুরু করে—এতটুকু উৎসাহ আছে মনে হয় না।

আমি যদি আজ ভাত খাইছি, তবে কি কইলাম!

মাখন সজোরে নিজের উরুতে চাপড় মারে!

শৈল মাছ ভাজতে ভাজতে মুখ ফিরিয়ে এক গাল হেসে বলে, না খাইলা, আমি একাই খাইয়া শেষ করুম—খোকা আর আমি। কতকাল পরে আইজ ইচা মাছ খামু!

সুতরাং রান্না হলে মাখন গোগ্রাসে এক থালা ভাত খায় ঝিঙা কুমড়ার তরকারী আর গলদা চিংড়ির ঝোল দিয়ে। মোড়ে বিন্দের মনোহারী মুদীখানা পান বিড়ি সিগারেট বেচার মিশ্রিত দোকান থেকে চোদ্দ আনা সের দরে কেনা দেড় সের চাল—চাল বেশ ভাল। শৈল অর্দ্ধেক চালের ভাত রেঁধেছিল, তবু মাখন আর ছেলেকে খাইয়ে, তার পেট মনের মত ভরল না।

শৈল একরকম চাইতে না চাইতে দু'বাড়ীতে ঠিকে ঝির কাজ পেয়ে গেছে। বাচ্চাটা না থাকলে এবং ইচ্ছা করলে আরও এক বাড়ীতে কাজ সে জোটাতে পারে অল্প চেষ্টাতেই। অনেক ঝি তিন বাড়ীতে ঠিকে কাজ করে।

দেখা যায়, মাখনের কাজ জোটানো অত সহজ নয়!

কোন্ কাজ জুটিয়ে নেবে তাই তার ঠিক নেই।

চাষা মানুষ, চাষ করা ছাড়া কোন কাজ জানে না।

চাষীর মেয়ে চাষীর বৌ বলেই শৈল ঘরকন্নার কাজে পাকা—বাসন মাজা, মশলা বাটা, নিকানো, পোছান, উনান সাজানো, কয়লা ভাঙ্গার

মত দৈনন্দিন সাধারণ সাংসারিক কাজে তো বটেই, ভদ্রঘরের অধিকাংশ মেয়ে বৌ যে কাজ একেবারেই জানে না অথচ আজ রেশনের ধুলো কাঁকড় মেশানো চাল আর গমকে কাজ না জানলে খাওয়ার যোগ্য করা যায় না—যেমন, কুলো দিয়ে ঝেড়ে নেওয়া—সে কাজেও!

শৈল দু'বাড়ীতে নিয়মিত বাসন মাজাটাজার কাজ করে—চার পাঁচ বাড়ীর গিন্নিরা তাকে ডাকিয়ে তার সুবিধা আর অবসর অনুসারে তাকে দিয়ে কুলো চালিয়ে কয়লার গুঁড়ো গোবর আর মাটি মেশান গুল তৈরী করিয়ে, চাল বা নগদ পয়সা মজুরি দেন।

কেউ কেউ বলে, কাজটা করে দিয়ে এবেলা খাবি এখানে।

অর্থাৎ একবেলা খাওয়াটাই মজুরি।

বড় খিদে শৈলর। মাছ ডাল ভাজা তরকারী আশা ক'রে সে মহোৎসাহে কাজ করে দেয়। বাবুরা ভালমন্দ কতরকম খায় ঠিক ঠিকানা আছে কি!

খেতে বসে সে টের পায়, বাবুদেরও খাওয়াদাওয়ার বড় দুর্দ্দশা!

যাই হোক, ভাল জিনিস না পাক, খানিকটা ডাল আর খানিকটা তরকারী দিয়ে সপুত্র পেট ভরানোর মত ভাত তো সে পায়। খিদে কি অত বাচ-বিচার পছন্দ অপছন্দ জানে না মানে। নুন কাঁচা লঙ্কা দিয়ে পেট ভরা ভাত পেলে সে বর্তে যায়!

বানুবাট বাধায় মাখন।

তেড়ে বলে, এত দেরী ক্যান? কোন কাম কইরা আইলি তুই যে এত দেরী হইল?

কিবা কথা কও? ঘরের মাইনষেরে খাওয়াইয়া তবে আমারে দিছে না?

দুপুরে বিন্দের মা শৈলকে ডাকে। বলে, আয় হাড়হাবাতে বোকা মেয়ে, চুল বেঁধে দি। খেটে মরবি বলে চুলটাও বাঁধবি নে? কি কুক্ষণে যে তোকে দেখে মোর মায়া বসেছিল রে—

কামে যামু না?

যাবি, যাবি। সাত তাড়াতাড়ি কাজে যেতে অত তড়বড়াস নে॥ দেরীটেরী করে যাবি মাঝে মধ্যে। আরে মাগী, মন দিয়ে টাইম মত যত খাটবি তত পেয়ে বসবে যে, এটা বুঝিসনে! না খাটিয়ে কেউ তোকে একটা বাড়তি পয়সা দেয়? বাসি ভাত নর্দ্দমায় ফেলে দেবে, তবু তোকে দেবে না। দিয়েছে কেউ?

ক্যান দিব না? দয়ামায়া নাই মাইন্‌ষের? তিনতালা বাড়ীর মাঝের তলার উনি—

ফর্সা মোটা সুন্দরী মাগীটা?

হ। উনি আমারে ডাইকা নিয়া আলাপ করেন, কোন কাম করান না। গা হাত পা টিপা দেই, ঘামাচি মারি, উঁচা পেটটারে দইলা মইলা দেই—

বিন্দের মা মুচকে মুচকে হাসে।

বলে, না লো ছুঁড়ি ফর্সা মোটা সুন্দরী বৌটা তোকে মোটেই খাটায় না। আধঘণ্টা একঘণ্টা তোকে দিয়ে শুধু গা টেপায় পা টেপায় ঘামাচি মারিয়ে নেয়। একটু আদর চেয়ে নেয় তোর কাছে। তারপর আদর করে গলার হারটি খুলে তোর গলায় পরিয়ে দেয়। দেয় তো?

তা না দিক, শৈলর ছেলেকে দু'একটা লজেন্স চকোলেট তো দেয়। শৈলকে দু'চার আনা পয়সা তো দেয়। ভরসা তো দেয় যে রাতদিন খাওয়া পরার চাকরী নিয়ে থাকতে চাইলেই শৈলকে সে রাখবে। কিন্তু উপায় কি, মাখনের জন্য তো সেটা হবার নয়।

মা গো মা! আর পারি নে তোর সাথে!—শৈলর জট বাঁধা রুক্ষ চুল নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বিন্দের মা মেয়ে বৌ রোগে দুর্ভিক্ষে মারা যাওয়ার খবর পেয়ে উতলা হওয়ার মত ব্যাকুল ভাবে বলে, গাঁ থেকে তোরা এমন হাবাগোবা এসেছিস্, মাইরি বিশ্বেস হয় না মেয়েলোক এমনি গরু ছাগলের মত বোকা হয়। তোর রোজগারে খাচ্ছে মানুষটা, উঠতে বসতে তোকেই লাথিগুতো মারছে, তবু তুই আটা-সেটাঁর মত লটকে রয়েছিস ওটার সাথে।

শৈল মাথা সরিয়ে নেয়। বলে, জট ছাড়াইয়া কাম নাই, বড় লাগে। চুল বাঁধুম অনে সুদিন আইলে।

আর এসেছে তোর সুদিন, যা বোকা তুই। সব হাতে তুলে দিস কেন, টাকা পয়সা কিছু লুকিয়ে রাখতে পারিস না?

কই লুকামু? টের পাইলে মাইরা ফেলাইব!

তুই করবি রোজগার, তোকেই মেরে ফেলবে? থাকিস কেন অমন লোকের সঙ্গে?

রাম রাম, অমন কথা কইও না। তেমন মানুষ না আমি।

মাখন বেশ খানিকটা বেহিসাবী, বেপরোয়া এবং রগচটা মানুষ। সেই সঙ্গে স্বার্থপর। এ সমস্তই সহ্য হত শৈলর। যা হাতে পায় বেশী বেশী খেয়ে শেষ করে দিয়ে দুরবস্থার সীমা রাখে না বটে কিন্তু ভাল মন্দ জিনিসও সে একা খায় না, বেশী বেশী খাদ্য শুধু নিজের পেটেই চালান দেয় না। তাদের সঙ্গেই যে ভাল খায়, কষ্টও ভোগ করে সমান ভাবে।

কিন্তু দিন দিন অসহ্য হয়ে উঠছে তার সন্দেহ করা রোগটা। যুক্তি তর্ক কিছুই সে বোঝে না। যদুর মা একবাড়ীতে খাটে কাজে গিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরতে পারে, তবু তার কথা তুলে কুটিল বাঁকা চোখে

চেয়ে প্রায়ই সে জানতে চায় কি এমন কাজ শৈল করে, তার কেন ফিরতে দেরী হয় ?

রেশন আনার পয়সা নেই। বিন্দের মার পরামর্শে মাখন নিজেই তাকে মাইনের দুটো টাকা আগাম চেয়ে আনতে বলে, শৈল টাকা এনে দিলে সে-ই বলে, চাওন মাত্র টাকা দেয়, বাবুর সগে খুব খাতির না ?

কাজ খোঁজার নামে বেরিয়ে গিয়ে আচমকা মাখন ফিরে আসে !

তাড়াতাড়ি ফিরা আইলা ?

আইলাম। ক্যান অসুবিধা হইছে নাকি তর ? কেউ আসব নাকি ?

একদিন একটু উৎসাহের সঙ্গে কাজের খোঁজে যায় তো তিন দিন ঘর ছেড়ে বেরোবার নাম করে না। শৈল জানতে পারে, সে কাজে গেলে মাখন বেরোয় এদিক ওদিক ঘোরা ফেরা করে, কাজ সেরে তার ঘরে ফেরার সময় ফিরে আসে।

শৈল অনুযোগ দিলে, কাজের খোঁজে না গিয়ে ঘরে বসে থাকার জন্য ঝগড়া করলে, মাখন রেগে আগুণ হয়ে ওঠে ! কেন, তাকে ঘর থেকে তাড়াবার এত আগ্রহ কেন ? কাজে গিয়ে কার সাথে কি বজ্জাতি করে কে জানে, তাকে তাড়িয়ে ঘরেও বজ্জাতির সাধ ?

তুই আরও টাকা পাস। কোথায় লুকাইয়া রাখছস ক' আমারে।

প্রচণ্ড ঝগড়া বেধে যায়। মাখন ধাক্কা দিয়ে শৈলকে ফেলে দেয়। শৈল বসে বসে চোখে আঁচল দিয়ে কাঁদে।

বিন্দের মা কুটিল হিসেবী চোখে তাদের কলহ লক্ষ্য করে যায়।

বৌ আর বাচ্চা দু'জনের কান্না অসহ্য ঠেকায় বাচ্চাটার গালে একটা চড় বসিয়ে মাখন বেরিয়ে যায়। বিন্দের মা এসে কাছে বসে

গভীর সহানুভূতির সঙ্গে বলে, কি পাষণ্ড বজ্জাত মানুষ মাগো! এমন করে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলে, এইটুকু বাচ্চার গালে অত জোরে চড় বসালে! তোকেও বলি বাছা, কেন এত সহ্য করিস? যত সইবি, তত বেড়ে যাবে। আমি হলে বাপু লাথি মেরে খেদিয়ে দিতাম। নিজে তুই রোজগার করিস তোর ভাবনা কি?

শৈল চোখ মুছতে মুছতে বলে, আমি যামু গিয়া।

বিন্দের মা খুসী হয়ে বলে, তাই যা। আমি তোকে ঘর ঠিক করে দেব।

শৈল কাজে যাবার আগেই মাখন ফিরে আসে। কি ভাবে কোথা থেকে বিড়ি যোগাড় করে এনেছে সেই জানে, গোমড়া মুখে বসে জ্বলন্ত বিড়িটা টেনে শেষ করেই আরেকটা বিড়ি ধরায়!

শৈল কাজে গেলে বিন্দের মা মাখনের কাছে গভীর আপশোষ জানিয়ে বলে এ হল কলিকাল কি করবে বল তুমি। ইদিকে তোমার কাজ নেই উদিকে ছুঁড়ি পেয়েছে পয়সা কামানোর সোয়াদ। শুধু বাসনমাজার পরসায় কি মন উঠবে ওর? তোমার সাধ্যি আছে ওকে ঠেকিয়ে রাখবে! আজ বাদে কাল দেখবে কার সাথে ভেগেছে।

খুন কইরা ফেলুম।

বিন্দের মা মুখ বেঁকিয়ে ভেংচি দিয়ে বলে, খুন কইরা ফেলুম! আরে আমার মরদ রে! অতই সস্তা যদি হত খুন করা, গণ্ডা গণ্ডা মাগী খুন হয়ে যেত। বোকা হাবা কোথাকার। এটা বুঝি তোর সেই পাড়া গাঁ পেয়েছিস যে খুসী হলে খুন করবি? এ হল বাবা খাস কলকাতা সহর। কোথায় তলিয়ে যাবে মানুষের ভিড়ে এ জীবনে আর খোঁজ পাবি ভেবেছিস!

ঘুম খেয়ে রক্তবর্ণ চোখ মেলে মাখন বসে থাকে। নিজের অসহায় নিরুপায় অবস্থাটা সে মর্মে মর্মে অনুভব করছে টের পেতে বিন্দের মা'র বাকী থাকে না। সে গুজগাজ, ফিসফাস করে মাখনকে বোঝাতে থাকে সংসারের হাল-চাল, নিয়ম নীতি!

তার মতে খুব সোজা নীতি। মাখনের মত অবস্থায় যে পড়েছে তার কাছে অতি সুবোধ্য। পয়সা রোজগার করতে বেরিয়েছে যে মেয়েছেলে বাসন মাজা ছাড়াও অন্য উপায়ে বাড়তি রোজগার সে করবেই করবে। শ্রীভগবানেরও সাধ্য নেই তাকে ঠেকিয়ে রাখে। এভাবে চললে দু'দিন বাদে শৈল তাকে ছেড়ে যাবেই, তার অন্যথা নেই। তার চেয়ে শৈলও হাতে থাকে, তার বাড়তি রোজগারও হয়, সেটা ভোগও করতে পারে মাখন, এ ব্যবস্থা কি ভাল নয় সবদিক দিয়ে?

মাখন চুপচাপ শুনে যায়, কিছু বলে না। তার মুখ আর চোখের চাউনি দেখে বিন্দের মা-ই হঠাৎ এক সময় থেমে যায়। কে জানে কি রকম মতিগতি এসব গোঁয়ার রাগী মানুষের! রাগ সামলাতে না পেরে হাতের কাছে পেয়ে তাকেই হয় তো মেরে বসবে!

শৈল রেহাই পাবার উপায় খোঁজে।

যেমন তেমন উপায় নয় সদুপায়। যাতে মাথা বিগড়ানো মানুষটার হাত থেকে সে রেহাই পাবে অথচ সন্দেহের জ্বালায় জ্বললেও মানুষটার মধ্যে সেটা আগুনের মত দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবার কারণ ঘটবে না। কোন ভদ্রপরিবারে খাওয়া-পরা দিনরাত্রির কাজ পেলেই সব চেয়ে ভাল হয়।

শৈল এ রকম কাজ খোঁজে। কিন্তু কোলে তার ছেলে, তাকে কেউ ওভাবে রাখতে চায় না। তিনতলা বাড়ীর ফর্সা মোটা গিন্নি

বলে, ছেলে না থাকলে আমিই তো তোকে রাখতাম। ছেলের ঝন্‌ঝাট কে পোয়াবে বাবা।

আমারে রাখেন। পোলারে দিদিমার কাছে থুইয়া আসুম।

বেশ, পয়লা থেকে কাজে লাগিস।

বাচ্চাটাকে ছেড়ে থাকতে মরে যাবে শৈল, কিন্তু উপায় কি। মাখনের মাথা খারাপ হয়ে গেছে, ওর সঙ্গে আর বাস করা যায় না। শৈলর মা প্রথমে এদিকেই ঝির কাজ আরম্ভ করেছিল, কলে কাজ পেয়ে উঠে গেছে। কলের কাজে উপায় বেশী। তার কাছে ছেলেকে রেখে এলে মাঝে মধ্যে শুধু গিয়ে দেখে আসা চলবে। কিন্তু উপায় কি! মাস কাবারের আর মাত্র কটা দিন বাকী।

সেদিন ঠিকে কাজ সেরে ঘরে ফিরে ছাখে, তাদের কাঁথাকানি হাঁড়ি কড়াই ওপাশের চালার ছোট একটি ঘরে সরানো হয়ে গেছে। এই নীচু চালার খুদে খুদে ঘরগুলিও বিন্দের মা ভাড়া দেয়। এই ছোট ঘরখানাই খালি ছিল।

বিন্দের মা একগাল হেসে বলে, তোর কপাল ফিরেছে লো। আমার ছেলে তোর মিন্‌সেকে একটা কাজ জুটিয়ে দিয়েছে।

মাখন ঘরে ছিল না। সকাল বেলা বিন্দের সঙ্গে কারখানার কাজে ভর্তী হতে গেছে।

শৈলের মুখে হাসি ফোটে না। কাজ পেয়েছে, নিজে খেটে রোজগার করবে কিন্তু মতিগতি কি বদলাবে মানুষটার, মেজাজ নরম হবে? সারাদিন বাইরে থাকবে মাখন, সন্দেহের বিষে আরও সে জর্জরিত হবে। এ পোড়া সহরে এসে কপাল তার পুড়েছে চিরদিনের জন্য।

বিন্দের মা বলে, সুদিন এসেছে, আয় তেল দিয়ে চুল বেঁধে দি।

চুল বাঁইধা কাম নাই। ঘরের ভাড়া নিবা কত ?

যা দিবি তাই নেব। তোরা কি আমার পর ?

কি করে হঠাৎ তারা এত বেশী আপন হয়ে গেল বিন্দের মার শৈল বুঝতে পারে না। বুঝেই বা কি হবে? আর মোটে কটাদিন সে এখানে থাকবে।

বিকালে শ্রান্ত মাখন ফিরে আসে। লঙ্কা দিয়ে জল দেওয়া ভাত খায়। কথাবার্তা বিশেষ বলে না। শৈলও চুপ করে থাকে।

খানিক পরে মাখন ব্যঙ্গের সুরে জিজ্ঞাসা করে, মহারাণী কিছু জিগান না যে ?

কি জিগামু ?

মাখন গুম খেয়ে থাকে।

বিন্দের মা মাখনকে আড়ালে ডেকে বলে, আমি তো বাপু পারলাম না। তুমি বলে দাও, চুলে একটু তেল দিক, সাবান টাবান মেখে একটু সাফ-সুরুৎ হোক ?

বলব।

পরদিন খুব সকালে কাজে বেরোবার আগেই বিন্দের দোকান থেকে তেল আর সাবান এনে দিয়ে মাখন চোখ পাকিয়ে বলে, চুলে তেল দিবি, সাবান মাইখা চান করবি। ভূত সাইজা থাকলে ভাল হইব না কইলাম।

শৈল চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে থাকে।

ব্যাপারডা কি কও তো শুনি ?

ব্যাপার আবার কি ? ব্যাপার কিছু না।

কাজে লেগেই অদ্ভুতভাবে বদলে গিয়েছে মাখন। মেজাজ বদলায়নি, বরং আরও রুক্ষ হয়েছে, কথায় কথায় চটে উঠে গাল দেয়,

মারতে আসে। যতক্ষণ ঘরে থাকে গুম খেয়ে থাকে, মাঝে মাঝে তীব্র বিদ্বেষের দৃষ্টিতে শৈলর দিকে তাকায়। কিন্তু সন্দেহ করে না, একেবারেই না। ছুটির দিন এক বাড়ীতে গুল দিয়ে ফিরতে অনেক বেলা হল, মাখন একবার জিজ্ঞাসাও করল না তার দেরী কেন। এক অজানা আতঙ্কে শৈলর বুক কেঁপে ওঠে।

এ ঘরে উঠে আসার দিনচারেক পরে একদিন সন্ধ্যার পর বিন্দের মা মাখনকে ডেকে বলে, এই কাপড়খানা পরিয়ে পাঠিয়ে দাও। দিনের বেলা দেখে গেছে, পছন্দ হয়েছে। এই নাও তোমার ভাগের টাকা।

মাখন এক মুহুর্ত্ত চুপ করে থেকে বলে, আইজ যাইবো না, হাঙ্গামা করব। আর কিছু না থাক, মাগীর তেজ আছে ষোল আনা। আর কয়দিন যাক বুঝাইয়া রাজী করামু।

বিন্দের মা বলে, আ-মরণ! এর আবার বোঝানোর কি আছে? গোলমাল করে দু'ঘা লাগিয়ে দিবি।

তুমি বুঝবা না। বড় তেজ মাগীর।

মাসের শেষ তারিখ। পরদিন শৈল নতুন কাজে লাগবে। ভোরে উঠেই ছেলেকে মার কাছে রেখে আসতে যাবে। ফর্সা মোটা গিন্নীকে বলা আছে প্রথম দিনটা কাজে লাগতে দেরী হবে। রাত্রে শৈল ভাবে, আজ মাখনকে জানাবে, না একেবারে সকালে জানিয়ে বিদায় নেবে।

এখন জানালে যদি হাঙ্গামা করে?

মাখন জিজ্ঞাসা করে, এপাশ ওপাশ করস যে? ঘুম আসে না?

না।

মাখন খানিক চুপ করে থাকে! তারপর শৈলকে কাছে টেনে বলে, শোন, কাইল আমরা অন্য ঘরে উইঠা যামু।

ক্যান ?

এখানে থাকুম না। বিন্দের মা বড় পাজী বজ্জাত মানুষ।

যতই তার পক্ষ টানুক আর তাকে সুখী করার জন্য ব্যস্ত হয়ে নানা পরামর্শ দিক, শৈলর কি আর জানতে বাকি ছিল যে বিন্দের মা পাজী বজ্জাত মানুষ। তার সঙ্গে হঠাৎ মাখনের খাতির জমতে দেখে আর তাকে তেল সাবান মাখিয়ে ভাল কাপড় পরাবার ঝোঁক চাপতে দেখে এটাও শৈল আঁচ করেছিল যে তাকে ফাঁসাবার একটা চক্রান্ত চলছে তলে তলে।

কিন্তু মাখনের দিকটা সে বুঝে উঠতে পারছিল না কোনমতেই। বিন্দের মা'র খারাপ মতলব থাক, মাখন নিশ্চয় জেনে বুঝে তার মতলবে সায় দেয় নি, বিন্দের মা নিশ্চয় তাকে ভুলিয়ে ফাঁদে ফেলেছে।

নইলে তাকে মিথ্যা সন্দেহ করেই যে মানুষটার এত জ্বালা সে কখনো জেনে শুনে বিন্দের মা'র বজ্জাতিতে সায় দিতে পারে ?

মাখনের কথা শুনে ভয় ভাবনার একটা পাহাড় যেন নেমে যায়, হাল্কা হয়ে যায় শৈলর দেহমন। সে ভাবে মাখন তবে ধরে ফেলেছে বিন্দের মা'র আসল মতলব !

আর মাখন ভাবে, ভাগ্যে শৈল টের পায় নি মরিয়া হয়ে বিন্দের মা'র পরামর্শে কি কাজ করতে যাচ্ছিল। ভাগ্যে বিগড়ানো মাথাটা তার ঠিক হতে আরম্ভ করেছিল একটা কাজ পেয়েই, দশজনের সঙ্গে খাটতে সুরু করেই !

শৈল বলে, কাল থেইকা আমি খাওয়া পরার কামে লাগুম— রাতদিন থাকুম।

ক্যান ?

সন্দেহ করবা, মারবা—তোমার লগে থাকুম না।

মাখন খানিক ভেবে চিন্তে বলে, হ, ঠিক। কইছস আমার মাথাটা বিগড়াইয়া গেছিল। ক্যান এমন হইল কিছুই বুঝলাম না। আর সন্দেহ করুম না।

করবা না?

না। তর গা ছুঁইয়া কইলাম।

সুতরাং শৈলর আর ফর্সা মোটা গিন্নীর বাড়ী কাজ নেওয়া হয় না। অন্য পাড়ায় একটা ঘর নিয়ে তারা দু'বাড়ীতে ঠিকে কাজ করে। সকালে রান্না হয় না, রাত্রে জল ঢালা ভাত খেয়ে মাখন কলে খাটতে যায়।

মাখনের বিগড়ানো মাথাটা কিসে সারল সে নিজেও বোঝে না; শৈলও বোঝে না। রাজী হয়ে গিয়েও মাখনের মাথাটা কেন বিগড়ে গেল এটা বোঝে না বিন্দে আর বিন্দের মা।

না বুঝলেও নেমকহারাম বজ্জাতটাকে কাজ জুটিয়ে দেওয়ার জন্য মায়ে পোয়ে তারা আপশোষ করে।

সতী

রাস্তার ধারে একটা লোক মরে পড়ে আছে।

আগের দিন পাড়ায় কেউ তাকে মরার আয়োজন করতে ত্যাখেনি। তীর্থগামিনী পিসীকে হাওড়া ষ্টেশনে গাড়ীতে তুলে দিয়ে প্রায় রাত এগারোটার সময় নরেশ বোধ হয় শেষ বাসেই রাস্তায় প্রায় ওখানটাতেই নেমেছিল।

সে নাকি পাড়ার চেনা ঘেয়ো কুকুরটাকে ঠিক ওইখানে থাবায় মুখ গুঁজে পড়ে থাকতে দেখেছিল। তাকে বাস থেকে নামতে দেখে কুকুরটা অতি কষ্টে উঠে এসে দাঁড়িয়ে লেজ নেড়েছিল। নরেশের বড় ভয় হয়েছিল, কুকুরটা পাছে কামড়ে দেয়।

কাজেই সিদ্ধান্ত করা যায় যে রাত এগারোটার আগে লোকটা ঘেয়ো কুকুরটার জায়গা বেদখল করে চিৎ হয়ে শুয়ে মরে নি। শেয়াল কুকুর ছাড়া রাত্রিবেলায় কেউ তাকে মরতেও ত্যাখেনি।

ভোরে উঠে দেখা গেল। রাত্রে কোথা থেকে এসে এইখানে শুয়ে মরেছে। কাউকে না জানিয়ে চুপি চুপি—একা। জগতে এতটুকু অশান্তি সৃষ্টি না করে।

কোমরে এক ফালি ন্যাকড়া জড়ানো। মরেও লজ্জা বজায় রেখেছে অথবা বলা যায়, লজ্জা বজায় রেখে মরেছে।

দেহটা অত্যধিক শীর্ণ শুকনো, যাকে বলে কঙ্কালসার। মাথায় একরাশি ধুলোয় মলিন রুক্ষ চুল, মুখে ইঞ্চিখানেক গোঁপ-দাড়ি

গজিয়েছে। ভাব দেখে অনুমান করা যায় যে লোকটা এককালে চুলও ছাঁটত, দাড়ি-গোঁপও কামাত, দু'তিন-মাস সেটা বাদ গেছে। গলায় সুতো দিয়ে ঝোলানো আস্ত সুপারির মত কালো কাঠের সুন্দর বৈষ্ণবী খোলের মাদুলিরূপী নিদানটি পাঁজরের উপর পড়ে আছে। বাঁ হাতের কনুইয়ে তিনটি মাদুলি, মানুষকে যা রোগ দুঃখ বিপদ আপদ থেকে ত্রাণ করে। গরীবকে বড়লোকও করে!

ভূতনাথ বলে, রোগে মরেছে মনে হয় না। রোগে এমন চেহারা হলে আর উঠে আসতে হত না, যেখানে শুয়েছিল সেখানেই মরত।

অভয় বলে, রোগে না মরলেও রোগেই মরেছে। যা ভাবছ তা চলবে না। এদেশে বাবা না খেয়ে কারো মরা বারন। আমেরিকার গম আসছে, দু'চার মণ এসেও গেছে।

বিমল বলে, না খেয়ে কেউ মরেও না। যে-ই মরুক মরবার আগে হার্টফেল করে মরে। হার্ট ফেল করে মরা ছাড়া গতি নেই মানুষের, তোমরা বলবে ষ্টার্ভেশন।

শচীন বলে, না বলাই উচিত। দেশের একটা মানসম্মান আছে তো? অন্য দেশে শুনলে ভাববে কি?

নরেশ ছেলেমানুষ, একটু ভাবপ্রবণ। কেউ মরেছে শুনলেই তার কষ্ট হয়, নিজের চোখে মরণ দেখলে তো কথাই নেই। সে বিরস বিষণ্ন মুখে বলে, খুনটুন হয়নি তো?

—খুন হয়েছে বৈকি। নইলে যোয়ান বয়সে মানুষটা মরে?

—ছোরাটোরা মেরে নয়, না? তাহলে রক্ত পড়ত। বিষটিষ খাইয়েছে?

—আরে বোকা, বিষ হোক যাই হোক, কিছু খেতে পেলে কি মরত?

অল্পে অল্পে বেলা বাড়ে।

রেশন আনা বাজার করা ওষুধ কেনা ছাড়াও হাজারটা কাজে মানুষ এদিক ওদিক যায় আসে। রাস্তায় লোক চলাচল বাড়ে, বাস লরী মোটর গাড়ীর হর্নের আওয়াজ অবিরাম হয়ে ওঠে, লোকে চোখ তুলে মৃতদেহটার দিকে তাকায়, কেউ একটু দাঁড়ায়, কাছাকাছি কয়েকজন যারা দাঁড়িয়ে আছে তাদের প্রশ্ন করে। কেউ তাকাতে তাকাতেই চলে যায়।

সময় নেই, উপায় নেই, স্পৃহা নেই। এক মুহূর্ত দাঁড়ালে হয়তো ফসকে যাবে আজও লাইনে দাঁড়িয়ে কয়েক ঘণ্টা ধন্না দিয়ে জরুরী দরকারী জিনিষটা পাওয়া, হয়তো লেট হয়ে যাবে কাজে। অর্দ্ধপুষ্ট অপুষ্ট শরীরে আর টানা যায় না বাঁচার লড়াই, খিদেয় ক্লান্তিতে ঘোলাটে মনের আকাশে দুর্ভাবনার মেঘে ঢেকে গেছে সব কৌতূহল আর শ্মশান-বৈরাগ্যের ব্যথা বোধ, খেদের অবিরাম বিদ্যুৎ ঝলকানিতে জ্বলে গেছে চাক্ষুষ মরণকেও খাতির করার সাধ।

না, সত্যিকারের মরণকে নয়। সে মরণকে তুচ্ছ করার সাধ থাকলেও সাধ্য কই।

ওরা হল ব্যস্ত বিব্রত কাজের মানুষ, এই দুর্দিনে সংসারের জোয়ালে জুড়ে দেওয়া মানুষ।

কাজ নেই বলে বিব্রত বিপন্ন মানুষও কি কম! ভিড় তাই জমে। মুখে 'আহা' বলে খুব কম লোকেই! হৃদয়গুলি ওদাসীন হয়ে গেছে বলে নয়। এ-রকম মরণ দেখে সহানুভূতি কি আর থাকে? অসহানুভূতিই একটা গভীর বিরাগের রূপ নিয়ে ভেতরটা ঘুঁটে দেয়।

রেশনের দোকানে আজ অসম্ভব ভিড়। নতুন হপ্তা আজ সুরু হল। রেশন নিয়ে গেলে তবে অনেকের বাড়ীতে আজ হাঁড়ি চড়বে।

নইলে পাঁচ সিকে সের চাল কেনা, নয় তো উপোস দেওয়া। মাসের এই শেষ হপ্তায় রেশন ছাড়া ক'জনেরই গত্যন্তর আছে ?

ঘড়ি আর ভিড়ের দিকে তাকালে ভরসা কমে আসে। মড়াটার জন্যই যথাস্থানে খবর পাঠাবার ব্যবস্থা করতে দেরী হয়ে গেছে দীননাথ আর অভয়ের। মানুষটা এসে মরেছে একেবারে বাড়ীর সামনে।

—ভাত খেয়ে আজ আপিস যাওয়া ঘটবে কি অভয় ?

—দেখা যাক।

লাইন দিতে হয় না, দোকানের টেবিলে কার্ডগুলিই পর পর ঘাড়ে চেপে লাইন দেওয়ার প্রতীক হয়ে স্তুপ হয়েছে। রেশন কার্ডে অদৃশ্য নাড়ীর সুতোয় এঁটে বাঁধা মানুষগুলি এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে জটলা করতে পারে।

তবে, নিরুপায় হয়ে শুধু জটলা করাই সার। আশ্বিনের সকালের উজ্জ্বল মধুর আকাশ বাতাস, প্রাণ কেন শারদোৎসবের ছোঁয়াচ আঁচ করতে পারে না কে জানে!

দেখা যায়, ছেলে কোলে একটি বৌ এগিয়ে আসছে ক্লান্ত মন্থর পায়ে। খানিক এগিয়ে থেমে দাঁড়িয়ে কি যেন বলছে পথের ধারের দোকান অথবা বাড়ীর মানুষকে। পরণের কাপড়খানা দেখে তফাৎ থেকে ভিখারিণী মনে হয় না।

রেশনের দোকানের সামনে এলে দেখা যায়, ছেঁড়া আর ময়লা হলেও পরণে তার তাঁতের রঙীন শাড়ী। বিবর্ণ বিশীর্ণ মুখে কোটরে বসা চোখ, তেলের অভাবে একরাশি ঘন চুল জট বাঁধছে। শুকিয়ে আমসি বনে গেছে কোলের বছর দেড়েকের উলঙ্গ ছেলেটা, যেন নেশার ঘোরে ঢুলু ঢুলু চোখে চেয়ে আছে বড় মানুষদের ভিড়টার দিকে।

পৃথিবীতে নবাগত শিশু। খিদে পেলেই চেঁচিয়ে চারিদিক মাত করার অধিকার সে যেন ত্যাগ করেছে—খিদেয় খিদেয় ঝিমিয়ে গিয়ে খিদের নেশায় ধুঁকবার অধিকার পেয়ে!

—এদিকে একটা মানুষকে দেখেছ বাবুরা? পাগলের মত দেখতে? কোমরে একটা কানি জড়িয়েছে, খুব চুল দাড়ি হয়েছে? দেখেছ, মোর সোয়ামীকে?

স্বামী আর সিঁদুর কিনা একাকার সবার চেতনায় তাই প্রথমেই স্বামীদের মনে হয় যে বৌটার কপালে আর সিঁথিতে যা লেপা আছে তা আসল সিঁদুর নয়, দেখলেই বোঝা যায় যে জল দিয়ে শানে পোড়া ইঁট ঘষে সিঁদুর বানিয়েছে—এই সিঁদুর সিঁথিতে যতটা পারে গাদা করে চাপিয়েছে, কপালের ফোঁটাটা করেছে মস্ত। তাকালেই যেন লোকে বুঝতে পারে যে সে বৌ—গেরস্ত ঘরের বৌ।

ভূতনাথ ভাবে, হায়রে, সহরে বিজ্ঞানের এত চোখ ঝল্‌সানো বিজ্ঞাপন, সহরে এসে তোকে ইঁটের গুঁড়ো দিয়ে নিজের গায়ে এই বিজ্ঞাপন আঁটতে হয়!

একজন বলে, কোনদিকে গেছে, স্বামীকে কোথায় খুঁজে বেড়াবে?

—এদিকে কাছে কোথা আছে। না খেয়ে ধুঁকছে মানুষটা, দূরে কোথা যাবে বাবু? যাবার সাধ্যি পাবে কোথা?

সেও ধুঁকতে ধুঁকতেই কথা বলে, প্রাণহীন স্তিমিত চোখে তাকায়।

—তোমার ঘর কোথা?

—সে অনেকদূর গাঁয়ে। মানুষটারে ছাখোনি বাবু কেউ?

ভূতনাথ বলে, এগিয়ে ছাখো তো, জলের কলটার কাছে, সাদা বাড়ীর সামনে। ওরকম একজন শুয়ে আছে দেখলাম যেন।

—শুয়ে আছে, না বাবু ?

—শুয়ে আছে না বসে আছে কি করে বলব বল ?

—মরে যায় নি ? শুধু শুয়ে আছে ? না বাবু ?

নরেশের সর্বাঙ্গে কাটা দেয়।

কাঁদ কাঁদ মুখে সে বলে, তুমি আমার সাথে এসো। ও বোধ হয় অন্য লোক।

নরেশদের বাড়ীটা পড়বে আগে—মরার কাছে পৌঁছবার আগে। পাশের একটা গলির মধ্যে ঢুকেই তাদের বাড়ী।

নরেশ ভাবে, আগে বাড়ীতে নিয়ে একে কিছু খেতে দেবে কি ? বাচ্চাটাকে একটু দুধ সে খাওয়াবেই। সেজন্য বাড়ীর লোকের সঙ্গে মারামারি করতে হলে মারামারি করবে।

কোন প্রশ্ন করে না কেন বৌটা ? তার স্বামীর মত একজন রাস্তার ধারে শুয়ে আছে শুনেও ব্যাকুল হয় না কেন ? লোকটা যদি সত্যি এর স্বামী হয়, মরে গেছে দেখে কিভাবে হাহাকার করে কেঁদে উঠবে, কিভাবে কপালে হাত দিয়ে বসে পড়বে নয় আছড়ে পড়বে—সেই মর্মান্তিক নাটকের কথা ভেবে তার নিজের বুকটা যে ধড়ফড় করছে !

কিন্তু দাঁড়িয়ে দেখতে হবে শুনতে হবে সব। পালিয়ে গেলে চলবে না। কাঁদাকাটার পালা চুকলে কি নাম কোথা থেকে এসেছে কি ভাবে কি ঘটেছে সব বিবরণ জেনে নিতে হবে।

গলির মোড়ে পৌঁছে নরেশ বলে, বাচ্চাটাকে একটু দুধ খাইয়ে নেবে এসো।

—আগে দেখে আসি। শুয়ে আছে, না ? ঘুমিয়ে আছে ?

ধীরে ধীরে পা টেনে টেনে সে হাঁটে। তফাৎ থেকে দেহটার

পড়ে থাকার রকম আর খানিক সরে দাঁড়িয়ে ভিড়ের মানুষগুলির জটলা করতে দেখেও সে একটু জোরে হাঁটে না।

মানুষের শুয়ে থাকা, ঘুমিয়ে থাকা আর মরে পড়ে থাকা যেন সমান হয়ে গেছে তার কাছে।

সিধুর দোকানের সামনে রোয়াকে একজন পুলিশ উবু হয়ে বসে আছে। মৃতদেহটা সরিয়ে নেবার ব্যবস্থা করতে হবে।

কাছে এসে দাঁড়ায় বৌটি। একদৃষ্টিতে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকে। নিস্পৃহভাবে বলে, মরে গেছে, না ?

—হ্যাঁ। তোমার স্বামী নয় ?

বৌটি মাথা হেলিয়ে জানায় মড়াটা তারই স্বামী।

নরেশ থ' বনে থাকে। এ কেমন বৌ, অ্যাঁ ? রক্ত মাংসের জীবন্ত মানুষ তো ? না, মৃত স্বামীর টানে—? পা শির্ শির্ করে নরেশের !

হঠাৎ চোখের সামনে শূন্যে মিলিয়ে না গিয়ে সকাল বেলার তাজা রোদে দেহের ছায়া ফেলে তাকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে নরেশ সবে একটু স্বস্তি বোধ করতে আরম্ভ করেছে, হঠাৎ যেন প্রাণ পায় বৌটি। বাচ্চাটার দু'পা ধরে শূন্যে তুলে প্রাণপণে রাস্তায় আছাড় মারে। মাথার খুলি চূর্ণ হয়ে যায়। তারপর নিজে ঝাঁপিয়ে পড়ে চলন্ত বাসটার সামনে।

প্রমাণ হয়, কপালে আর সিঁথিতে অত করে ইঁটের গুঁড়োর সিঁদুর লাগালেও বৌটি সেকালের ষ্ট্যাণ্ডার্ডের খাঁটি সতী নয়, তা হলে বাসের সামনে ঝাঁপ দিতে হত না, মৃত স্বামীকে দেখে আপনা হতেই প্রাণপাখী তার বেরিয়ে যেত। না খেয়ে না খেয়ে মর মর অবস্থাতে আপনা থেকে মরে যাওয়ার বদলে মরতে কি না দরকার হল চলন্ত বাসের।

লেভেল ক্রসিং

দুর্ঘটনায় গাড়ীটা জখম হয়। অল্পের লন্য বেঁচে যায় ভূপেন, তার মেয়ে ললনা এবং ড্রাইভার কেশব। খানিকক্ষণ কেউ কথা বলতে পারে না।

ললনা থর-থর করে কাঁপে।

রুমালে চশমা মুছে, মুখ মুছে ভূপেন জিজ্ঞাসা করে, এটা কিরকম ব্যাপার হল কেশব? তুমি তো কাঁচা ড্রাইভার নও?

কেশব বলে, সেইজন্যই বোধ হয় প্রাণে বেঁচে গেলাম আজ!

কেশবের নিজের তবে কোন দোষ নেই! তার অবহেলা বা বিচ্যুতির ফলে দুর্ঘটনা ঘটেনি! নইলে গাড়ীটা এভাবে জখম করিয়েও সে এমন ঝাঁজের সঙ্গে কথা কইতে পারে?

ললনা ঢোঁক গিলে বলে, কিজন্য হল এরকম?

—ষ্টিয়ারিং বিগড়ে গেল হঠাৎ।

—তাই নাকি? ও!

—আস্তে গাড়ী চালাই বলে রাগ করেন। জোরে চালালে আজ তিনজনে না মরলেও জখম হতাম। আমার মন বলছিল হঠাৎ গাড়ী বিগড়ে যাবে। একটা পুরানো রদ্দি মাল···

ললনা ভূপেনকে বলে, খুব তো বিশ্বাস করেছিলে সলিলবাবুকে? বন্ধুর ছেলে কি কখনো ঠকাতে পারে!

ভূপেন আপশোষ করে বলে, নাঃ, মানুষকে সত্যি বিশ্বাস নেই।

ভদ্রঘরের শিক্ষিত স্মার্ট ছেলে...

আপশোষ করে লাভ নেই। ভূপেন জরুরী কাজে বেরিয়েছে, যথাসময়ে যথাস্থানে তাকে গিয়ে পৌঁছতেই হবে। ললনা বেরিয়েছে সিনেমা দেখার জন্য, রাস্তায় তাকে সিনেমা হাউসটার সামনে নামিয়ে দেবার কথা। সিনেমা দেখাটা অবশ্য জরুরী কোন কাজ নয়।

ললনা বলে, তুমি ট্যাক্সি করে চলে যাও বাবা। আমি বাড়ি ফিরে যাব। গাড়ীর ব্যবস্থা আমরা করছি।

ভূপেন চলে গেলে ললনা বলে, আপনি তাহলে আমাদের প্রাণ বাঁচিয়েছেন?

—নিজের প্রাণ বাঁচাতে।

গাড়ীর ব্যবস্থা করার দায় কেশবের ঘাড়ে চাপিয়ে ললনা অনায়াসেই বাড়ী চলে যেতে পারত কিন্তু তখন গাড়ীতে বসে সে কেশবের সঙ্গে কথা বলে।

তার নিজের সম্পর্কে, তার আপনজনদের সম্পর্কে ললনার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নানা বিবরণ জানবার কৌতূহল গোড়ার দিকে বড়ই বিব্রত করত কেশবকে। মনে মনে বিরক্ত হত, রেগেও যেত।

ক্রমে ক্রমে সে টের পেয়েছে ললনার দোষ নেই। তার মধ্যে এ কৌতূহল সৃষ্টি করেছে সে নিজেই। বড়লোকের একেলে স্মার্ট মেয়ে হোক, লেখাপড়া আর গান দুয়েই দখল থাক, শিক্ষিত মার্জিত নরনারীর আসর জমিয়ে দেবার বিশেষ ক্ষমতা থাক, তার যে একটা হৃদয় আছে সেটা অস্বীকার করলে চলবে কেন!

বাড়ীর মাইনে-করা ড্রাইভার হলেও যোয়ান মানুষটার অদ্ভুত ঘর-টানের মানে জানবার কৌতূহল সে-হৃদয়ে জাগতে পারে বৈকি।

সারাদিন ডিউটি দিয়ে কেশব প্রায় রোজ রাত্রেই গ্রাম্য সহরতলীতে

তার পুরাণো ভাঙাচোরা নোংরা বাড়ীতে ফিরে যায়।

সহরের সৌখীন এলাকায় ভূপেনের আধুনিক ফ্যাসানের নূতন রঙকরা বড় বাড়ী। গ্যারেজের লাগাও ড্রাইভারের থাকবার ঘরটি ছোট হলেও খোলামেলা ঝকঝকে তকতকে। প্রতি বছর বাড়ীটির আগাগোড়া চূণ ফেরানো রঙ লাগানো হয়, কেশবের জন্য বরাদ্দ ঘরটিও বাদ যায় না।

ষ্টেশন পেরিয়ে সেই কতদূরে বোসপাড়া, সেখানে ইট বার-করা নোনায় ধরা সেকেলে দালানের ছোট ছোট ঘর, আলকাতরা মাখানো ছোট ছোট জানালা দিয়ে ভালো আলো-বাতাস খেলে না, ঘরের ভিতরটাও ভাঙাচোরা জিনিষপত্রে বোঝাই।

ওরকম একটা ঘরে রাত কাটাতে কষ্ট করে বাড়ী ফিরে যাওয়ার বদলে এখানে থাকলে রাত্রের খাওয়াটাও কেশব পায়।

বাড়ীর সেই একঘেয়ে শাক-চর্চ্চড়ি কুচো-চিংড়ির বদলে বড়লোকের বাড়ীর আধুনিক রুচিকর পুষ্টিকর সুখাদ্য। কিন্তু দেখা যায়, পরিচ্ছন্ন ঘর ও সুখাদ্যের চেয়ে বাড়ীর টানটাই কেশবের ঢের বেশী জোরালো।

রাত বেশী না হলে ষ্টেশন পর্যন্ত ট্রাম-বাস পাওয়া যায়। কিন্তু ষ্টেশনের পাশ দিয়ে লেভেল ক্রসিং পেরিয়ে গেলে আর ওসববালাই নেই।

বোসপাড়া পর্যন্ত প্রায় এক মাইল রাস্তা তাকে হাঁটতে হয়। সেখানে ছোট-বড় নতুন পাকা বাড়ী আছে, বৈদ্যুতিক আলো আছে, সাজানো মনোহারী দোকান ও লণ্ড্রী, হেয়ার-কাটিং সেলুন এসবও আছে, কিন্তু আছে অপ্রধান হয়ে। প্রাধান্য সেখানে জরাজীর্ণ কাঁচা-পাকা বাড়ীর, গেঁয়ো বাঁশঝাড় ডোবা-পুকুরের সঙ্গে মেশানো সহুরে বস্তি খাটাল আর কাঁচা নর্দমার।

বাগান-বাড়ী আছে দু'চারটা। কিছু লোকের ছোটখাটো বাস-ভবনের লাগাও একরত্তি বাগানেও সখের সুগন্ধি ফুল কিছু কিছু ফোটে। কিন্তু ফুলের গন্ধ হটিয়ে দুর্গন্ধই জাহির করে রাখে নিজেকে!

তাছাড়া আছে মশা আর মাছি। দুয়েরই অখণ্ড প্রতাপ।

তবু কেশবের ফিরে যাওয়া চাই!

বিশেষ কারণে রাত বেশী হয়ে গেলে ট্রাম-বাস মেলে না, কেশব হেঁটেই রওনা দেয়। ললনাদের বাড়ী থেকে ষ্টেশনও প্রায় আধ-মাইল রাস্তা।

ফিরে আসতে হয় খুব ভোরে। অনিমেষের তিয়াত্তর বছরের বুড়ী মাকে রোজ সকালে গঙ্গার ঘাটে নিয়ে যেতে হয়।

কেশব বিয়ে করেনি।

অর্থাৎ আলোয় ঝলমল খোলামেলা পরিচ্ছন্ন এলাকায় সুন্দর বাড়ীতে এমন সুবিধাজনক একটি ঘর থাকতে, ভাল খাওয়া পাওনা থাকতে, নিজের বাড়ীতে আপনজনের মধ্যে শুধু কয়েক ঘণ্টা ঘুমোনোর জন্য ফিরে যাওয়া!

তার কি কোন মানে হয়?

সেকেলে গেঁয়ো স্বভাবের একগাদা আপনজন। মা-বোন মাসী পিসী ভাই-ভাজদের যে সংসারে নিজে সে প্রায় পরের মত হয়ে গেলেও যারা আজও তার আপনজন।

জখম গাড়ীটাকে টেনে গ্যারেজে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা হলে ললনা বলে, চলুন না দু'জনে সিনেমায় যাই? গাড়ীটা যখন নেই, আমি গাড়ীর মালিকের মেয়ে আর আপনি ড্রাইভার এ-তফাৎটাও এখন ভুলে যাওয়া যেতে পারে।

বোঝা যায়, এটা তার ঝোঁকের মাথায় হঠাৎ বলে বসা প্রস্তাব নয়। এতক্ষণ তাকে জেরা করে করে আলাপ চালিয়ে যাবার সময় কথাটা মনে মনে নাড়াচাড়া করছিল।

কেশব আমতা আমতা করে বলে, ছুটি যখন পেয়ে গেলাম, বাড়ী ফিরব ভাবছিলাম!

ললনা আহত হয় না, রাগও করে না, আশ্চর্য হয়ে তার মুখের দিকে তাকায়।

বলে, আমি শিগ্‌গির একদিন যাব আপনার বাড়ীতে, দেখে আসব কি আছে সেখানে, বাড়ী যেতে আপনি এত পাগল কেন! সিনেমা দেখে বাড়ী গেলে চলে না?

—সিনেমা দেখতে আমার বিশ্রী লাগে।

—বিশ্রী সিনেমা দেখতে যান বলে। বন্ধুরা কত টানাটানি করে, আমি ওসব সস্তা সিনেমায় কখনো যাই দেখেছেন?

কেশব ম্লান মুখে একটা নিশ্বাস ফেলে বলে, একটা সত্যি কথা বললে বিশ্বাস করবেন? আমার কি রকম অস্থির অস্থির করছে, মাথার মধ্যে যন্ত্রণা হচ্ছে।

ললনার মুখ বিবর্ণ দেখায়।

—আপনার কি কোন অসুখ আছে? অপেনার চেহারা দেখে তো...

—কোন অসুখ নেই। ডাক্তার তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করেছে, কোন খুঁত খুজে পায়নি। কষ্ট যেটা হয় সেটাও অদ্ভুত। মাথা ঘোরা নয়, এমনি যন্ত্রণা নয়, ভেতর থেকে কি যেন চাপ দেয়। আমার এখন কি মনে হচ্ছে জানেন? কোথাও ছুটে পালাই।

ললনা ম্লান মুখে বলে, তা হলে বাড়ীই যান।

কেশব চুপচাপ দাঁড়িয়ে একটু ভাবে।

হঠাৎ বলে, আচ্ছা চলুন তো সিনেমাতেই যাই আপনার সঙ্গে, দেখি কষ্টটা কমে কিনা। প্রশ্রয় না দিয়ে এটাকে জয় করার চেষ্টা করা যাক।

—খুব বেশী কষ্ট হলে...

—দেখি কি হয়।

দুজনে সিনেমায় যায়।

হাফ-টাইম পর্যন্ত কোন রকমে অপেক্ষা করে কেশব বলে, আমি আর পারছি না।

ললনা বলে, থাক্। আমিও আর দেখব না, ভাল লাগছে না। কাল আপনার আসবার দরকার হবে না।

তারপর বলে, আমি ট্যাক্সিতে বাড়ী ফিরব, সে পর্যন্ত আমার সঙ্গেই আসুন।

তখন সন্ধ্যা উৎরে গেছে। ভূপেনের আলোয় ঝলমল বাড়ীটার সামনে নেমে কেশব আরেকবার জিজ্ঞাসা করে, কাল তাহলে না এলে চলবে ?

ললনা বলে, কাল এসে কি করবেন ? এবার নিজেরা দেখে শুনে একটা নতুন গাড়ী কিনতে হবে। পরশুর আগে বাবার সময় হবে না।

ললনা এমনিভাবে কথা কয় যেন কেশবের মত তারও যেন ভিতরে কিছু চাপ দিচ্ছে।

কেশব ট্রামে ষ্টেশন পর্যন্ত যায়। ষ্টেশনের পাশে লেভেল ক্রসিংটা পার হলেই সহরতলীর একেবারে অন্য রকম চেহারা।

রেলপথটা আলোয় ঝলমল বড় বড় অট্টালিকার সহর আর নোংরা পুরানো জীর্ণ ঘরবাড়ী আধ অন্ধকার সহরতলীকে পৃথক করে রেখেছে।

এপারে সীমা কর্পোরেশনের, ওপারে আরম্ভ মিউনিসিপ্যালিটির।

দুপুরে এক পশলা বৃষ্টি হয়েছিল। ধুলো আর গোবরে রাস্তাটা প্যাচ প্যাচ করছে। এখানে ওখানে গর্ত, সেগুলিতে জলের বদলে জমেছে পাতলা তরল কাদা।

তবু কি ভিড় মানুষের!

শুধু ময়লা জামাকাপড় পরা বা অর্ধউলঙ্গ গরীব মানুষের ভীড় নয়। ফিট ফাট্ বেশধারী বাবু মানুষ, স্যুট পরা সায়েব মানুষ এবং ভাল শাড়ীপরা ভদ্রমহিলাও এই পথে হাঁটছে, দুপাশের দোকানে কেনাকাটা করছে। খানিক এগিয়েই সিনেমা। শো চলছে, ভিতরটা বোঝাই, তবু বাইরে গিজ গিজ করছে সব বয়সের ভদ্রাভদ্র মেয়ে পুরুষ।

পরের শো'র টিকিটের প্রয়োজনে এত আগে এসে ধন্না দিয়েছে।

চেনা মানুষ শুধায়, আজ সকাল সকাল?

কেশব বলে, ছুটি পেয়ে গেলাম।

অফিস করা শ্রান্ত চেনা মানুষ মন্তব্য করে, তোমার তো ভাই আরামের চাকরী! পরের মোটরে চেপে বেড়াও, খেয়ে দেয়ে খাটিয়ায় শুয়ে নাক ডাকাও।

কেশব মুখ বাঁকায়।

ঃ করে দেখলে আরাম টের পাওয়া যায়। বাবু হুকুম দেবে, জোরসে চালাও। জোরসে চালিয়ে মানুষ চাপা দিয়ে তুমি শালা মার খাও আর জেলে যাও। কত আরাম!

এগোতে এগোতে আরও কমে আসে রাস্তার আলোর জোর, দোকান পাটের দেখা মেলে দূরে দূরে, বাড়ীগুলির গ্রাম্যতা আর জীর্ণতা বেড়ে যায়। এবড়োখেবড়ো খোয়ায় তৈরী এই প্রধান রাস্তা থেকে দুপাশে পাড়ার মধ্যে ঢুকে গেছে ইটের গলিগুলি। বাগদী পাড়ার

ফাঁকা জায়গায় বাজারটা খাঁ খাঁ করছে দেখা যায়। এখানে সকালে একবেলা বাজার বসে।

বোসপাড়ার মোড়ে বিবর্ণ থামটার মাথায় টিম টিম করে জ্বলছে একটা অল্প পাওয়ারের বাল্‌ব। এ যেন বাঁশঝাড় ডোবাপুকুর এলাকার মানুষগুলিকে জানিয়ে দেওয়া বৈদ্যুতিক আলো জ্বললেই কি এসপ্লেনেডের মত আলোয় ঝলমল করে ?—এটাও বৈদ্যুতিক বাতি, এদিকে তাকিয়ে ঘরের ডিবরি আর লণ্ঠন নিয়েই সন্তুষ্ট থাকো।

সন্ধ্যাদীপ জ্বালো ভেজাল তেল দিয়ে, ছেঁড়া ন্যাকড়ার সলতে পাকিয়ে। সে আলোতে শান্তি আছে, স্নিগ্ধতা আছে! এটাতো নিছক কাচের খেলনার আলো।

কেশব একটু দাঁড়ায়। এখন মনে হয়, কত দূরে যেন ভেসে এসেছে লেভেল ক্রসিং-এর ওপারে ললনাদের সহর, মন থেকে যেন প্রায় মুছে গেছে চোখ-ঝলসানো আলো, সহরের জমকালো রূপ আর গাড়ী ও মানুষের কলরব।

সেও ওই ধোঁকাবাজিতে বিশ্বাস করে—সভ্য জগতের সভ্য জীবনের কোলাহল থেকে দূরে পালিয়ে শান্তি ও স্নিগ্ধতা খোঁজার ধোঁকা-বাজিতে। নইলে ললনার অত আগ্রহ সত্ত্বেও সিনেমা শোটা শেষ পর্যন্ত না দেখে কিসের আকর্ষণে সে ছুটে এল এই আধা অন্ধকার ডোবার সোঁদা দুর্গন্ধে ভারি বাতাসের গেঁয়ো এলাকায় ?

শরতের মনোহারী ও মুদীখানা মেশান দোকানের বাল্‌বটা জোরালো আলোই দেয়। কেশব দোকানে দু'পয়সার নস্য কিনতে যায়।

নস্য দিয়ে শরৎ তার হাতে একটা ঠোঙ্গা দেয়, বলে, গুড়টা বাড়িতে পৌঁছে দেবে ? ছোঁড়াছুঁড়িগুলি কি মিষ্টিটাই খেতে পারে!

প্রৌঢ় শরতের মুখে একটা শান্ত নিরুত্তেজ ভাব, জীবনে তার যেন কোন রস-কষ নেই। স্থানীয় স্কুলে বাংলা পড়ায় আর এই দোকানটা চালায়, নীরস একঘেয়ে হয়ে গেছে তার জীবনের লড়াই।

শরতের দোকানের পাশ দিয়ে কেশব দক্ষিণ দিকে বোসপাড়ার রাস্তায় ঢোকে। বোসপাড়ায় ছাড়া ছাড়া থোক থোক ঘন বসতি। কাছাকাছি ঘেঁষাঘেঁষি হয় তো আট দশটি বাড়ী, তার পরে খানিকটা ফাঁকা মাঠ পুকুর বাগান ঝোপ জঙ্গল।

বড় বড় বাড়ীগুলি আর নতুন যে বাড়ী উঠেছে সেগুলিই কেবল পুরাণো বাড়ীর কোন একটা কোন না ঘেঁষে কম বেশী তফাতে তফাতে দাঁড়িয়ে আছে।

সহরে এখন রাত বেশী হয়নি। আলো নিভিয়ে বোসপাড়া ঘুমিয়ে না পড়লেও অনেকটা নিঝুম হয়ে এসেছে, রাস্তায় লোক খুব কম। মাঝে মাঝে কোন দাওয়ায় বসেছে কয়েকজনের আড্ডা, কোন বাড়ী থেকে শোনা যাচ্ছে ছেলেমেয়ের চেঁচিয়ে পড়া, মুখস্ত করা, দু'একটা বাড়ীতে আবার কিন্তু রেডিও বাজছে।

প্রকাণ্ড বটগাছটার লাগাও সাদা চূণকাম করা চৌকো একতলা বাড়ীটা আবছা আঁধারে বড়ই রহস্যময় দেখায়, সংলগ্ন আটচালা দুটো সে রহস্যকে আরও ঘনীভূত করেছে। ভিতরে আলো জ্বলছে, মানুষের গলার আওয়াজ বাইরে ভেসে আসছে, নাকে এসে লাগছে রান্নাঘরের সম্বরার গন্ধ। তবু তারাভরা নীলাকাশ যেমন প্রকাশ্য হয়েও রহস্যময়, বৈশাখী গুমোট সন্ধ্যায় নিথর জমকালো বটগাছটা যেমন জীবন্ত হয়েও মৃতের মত ভয়ের রহস্যে ঘেরা, তেমনি সাধারণ ইটের বাড়ীটির ছায়াচ্ছন্ন শুভ্রতা যেন ছায়ালোকের প্রতীকের মত রহস্যানুভূতিকে নাড়া দেয়।

দালানটার ভিতরে ছোট একটু উঠান আছে। এদিকে বেড়ায় ঘেরা বাগান। মাচা আছে তিনটি, লাউ কুমড়ো আর উচ্ছে গাছের। কয়েকটা জবাগাছে ফুলও ফোটে।

রান্না হয় দালানের একটু তফাতে কাঁচা চালাঘরে।

দালানের ভিতরে না গিয়ে বাগান দিয়ে রান্নাঘরে যাওয়া যায়।

মায়া উনানে তরকারী চাপিয়ে শরতের ছেলে গণেশের গায়ের ঘামাছি মারছিল, কেশবকে দেখে তার মুখে একটু অদ্ভুতরকম শান্ত আর মিষ্টি হাসি ফোটে।

কেশব বলে, শরতদা গুড় পাঠিয়েছে।

গুড়ের ঠোঙাটা রেখে মায়া গণেশের চিবুকে চুমু খেয়ে বলে, এবার পড়তে যাও তো মাণিক। আর পাহারা দিতে হবে না।

দালান কাছেই, মানুষ কথা বললে শোনা যায় কিন্তু সন্ধ্যার পর চালাঘরে একা রাঁধতে মায়ার ভয় করে। একজনকে তার সঙ্গে থাকতে হয়।

চালার এপাশে কাছাকাছি আর বাড়ী নেই, গাছপালা জঙ্গল আর পুকুর। তার ওদিকে কেশবের বাড়ী।

কেশব তামাসা করে বলে, সন্ধ্যারাতে এত ভয়?

মায়া বলে, ভয় করবে না? ওই আঁধার জঙ্গল, গণেশ ছিল তবু গা-টা ছমছম করছিল।

বছরখানেক আগেও ডিবরি জ্বলত এ ঘরে, আজকাল শালের খুঁটির গায়ে বসানো ল্যাম্প আলো দেয়।

মায়া বলে, মুখ শুকনো দেখছি? খুব খাটিয়েছে বুঝি আজ?

—না সারা দুপুর ঘুমিয়েছি।

—তবে ?

—একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল। অল্পের জন্যে বেঁচে গেছি।

ল্যাম্পের রঙীন আলোয় ঠিক বোঝা যায় না কি রকম পাংশু বিবর্ণ হয়ে গেছে মায়ার মুখ। চোখে পলক নেই আর ঠোঁট ফাঁক হয়ে আছে দেখে অনুমান করা যায় সে কি রকম ভড়কে গেছে।

মায়া রূপসী কিনা বলা কঠিন। তবে তেল-চকচকে একরাশি কালো চুলে ঘেরা শ্যামল রঙের মুখখানায় তার লাবণ্য ঢল ঢল করছে। সস্তা তাঁতের শাড়ীটাই যেন তাকে ভাল মানিয়েছে।

কেশব হেসে বলে, কি হল ?

মায়া ঢোক গেলে।

চাপা সুরে বলে, ওই আবার কালী আসছে। দুদণ্ড ভাল করে কথা কইবার উপায় নেই।

শরতের মেয়ে কালীর বয়স বছর এগার, এই বয়সেই সে ইজের ফ্রক ছেড়ে শাড়ী ধরেছে। ডুরে শাড়ীর আঁচল লুটিয়ে বেণী দুলিয়ে এসে কেশবের দিকে বাঁকা চোখে চেয়ে সে মায়ার কাছে আব্দার জানায়, খিদে পায় না, ঘুম পায় না মাসীমা ? কত রাঁধবে তুমি ?

মায়া ঝংকার দিয়ে বলে, রান্না বাকী আছে না কি আমার ? এবার তরকারী নামাব। ডেকে আন গে' সবাইকে, ঠাঁই করে নিয়ে বোস। লণ্ঠন আনিস্।

ভাইবোনদের ডেকে আনতে কালী দালানের মধ্যে অদৃশ্য হতেই মায়া চট করে কাছে এসে বলে, বুকটা টিপ টিপ করছে। এ কাজ ছাড়তে হবে তোমাকে। কি হয়েছিল সব যতক্ষণ না শুনছি বুকের কাঁপুনি যাবে না। এক কাজ কর, জামা কাপড় ছেড়ে এসে দালানে সবাইকে বলবে ঘটনা কি হয়েছিল, আমিও শুনব। কাল ছুঁড়ি দেখে

গেল, বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে কথা কইলে দিদি আবার ঝাড়বে।

কেশব বাগান দিয়ে ঘুরে রান্নাঘরে এসেছিল এবার সে দালানে ভিতর দিয়ে ফিরে যায়।

দালানের ভিতরে বারান্দায় শরতের বড় ছেলে রঞ্জন পড়ছিল, কেশবকে দেখে সে বলে, কেশবদা কোন্ দিক দিয়ে এলে ?

কেশব বলে, শরতদা ঠোঙ্গায় গুড় দিয়েছিল, রান্নাঘরে মায়াকে দিয়ে এলাম।

ঘর থেকে অবলা জিজ্ঞাসা করে, কেশব নাকি ? বসবে না ?

অবলার হয়েছে পক্ষাঘাত। আজ বছর তিনেক দিবারাত্রি তার বিছানায় শুয়ে কাটছে। সেটাই বোনকে আনিয়ে কাছে রাখার কারণ, তার আধ ডজন ছেলেমেয়ের সংসারটা মায়াকে দেখাশোনা করতে হয়।

কেশব বলে, আজ একটা অ্যাকসিডেণ্ট ঘটে মরছিলাম প্রায়। জামাকাপড় ছেড়ে এসে বলছি ব্যাপার।

কেশবের বাড়ীতে অনেক লোক। তার বিধবা মা, তিন ভাই, দুটি বোন, মেজ ভায়ের বৌ, তার দুটি বাচ্চা ছেলেমেয়ে, একজন পিসী ও তার ছেলে।

ছোট ছোট কুঠরি আছে অনেকগুলি। কেশব একা একখানা ঘর দখল করলেও ঘরের জন্য অসুবিধা হয় না। তবে কেশবের সেজভাই প্রণব এবং পিসীর ছেলে ভোলার বিয়ে হলে ঘরের টানাটানি পড়বে।

পিসী পারলে রাত পোহালেই ছেলের বিয়ে দেয়। কেশবেব ভয়ে কিছু করতে পারে না। কে জানে কি রকম বিবেচনা কেশবের ! ব্যাটাছেলে তো রোজগার করবেই একদিন—চাকরী পেয়ে হোক,

ফিরিওলাগিরি কুলিগিরি করেই হোক। পাকাঘরে দুধে-ভাতে কিম্বা কুঁড়েতে আধপেটা শাকভাত খেয়ে জীবন কাটাবে, যেমন অদৃষ্টে আছে।

কিন্তু বয়স গেলে যে বিয়ে করার সুখটাই নষ্ট হয়ে গেল জীবনে? দুদিনের জন্য হলেও এই তো বয়স বিয়ের, আসল রস আর আনন্দ পাবার।

জীবনটাই তো অস্থায়ী মানুষের।

কেশবের নিজের ফস্‌কে গেছে কিনা, অন্যের জীবনে এ রস আর আনন্দের কোন দাম তার কাছে নেই।

সহর থেকে এটা ওটা আনার ফরমাস ছিল দুতিন জনের। বিমলা জিজ্ঞাসা করে, খালি হাতে এলি, পাটি আনিসনি তো?

কেশব বলে, না। আমি বলে অ্যাক্‌সিডেণ্ট হয়ে মরছিলাম—

: মাগো! বলিস কিরে? ভগবান দীনবন্ধু!

ফরমাসী জিনিষ না আমার জন্য যারা অনুযোগ দেবার জন্য উদ্যত হয়েছিল তারা একেবারে চুপ করে যায়।

সংক্ষেপে ঘটনার বিবরণ জানিয়ে জামা-কাপড় ছেড়ে কেশব পুকুরে গিয়ে স্নান করে আসে। তাড়াতাড়ি না যাওয়াই ভাল। আধ ডজন ছেলেমেয়েকে খেতে বসিয়েছে, ওরা খেয়ে না উঠলে মায়া এসে শুনতে পাবে না তার দুর্ঘটনার কাহিনী।

অনেকটা দেরী করে গিয়ে সে দেখতে পায় শরৎ ইতিমধ্যে দোকান বন্ধ করে বাড়ী এসেছে।

সে বলে, অ্যাকসিডেণ্ট হয়েছে নাকি শুনলাম? তুমি যে বাড়ী শুদ্ধ আমদের ভাবিয়ে রেখে গেলে।

মাদুর পেতে তাকে বসতে দেওয়া হয়।

ঘর থেকে অবলা বলে, একটু জোরে জোরে বল কেশব। তোরা

কেউ টু শব্দটি করবি না।

কেশব দুর্ঘটনার কথা বলে যায়, শরতের চার বছরের ছেলেটাকে কোলে নিয়ে ঘুম পাড়াতে পাড়াতে মায়া কাছে বসে শোনে।

লণ্ঠনের আলোয় বিবর্ণ মুখ দিয়ে অস্ফুট ভয়ের আওয়াজ বার হয়।

তার কাহিনী বলা শেষ হলে অবলা বলে, তবু ভাগ্যি !

মায়া মন্তব্য করে, হাত পা জখম হতে পারে, প্রাণ যেতে পারে, এমন কাজ না করলেই হয় !

—কাজ না করলে খাব কি ?

—আর কি কাজ নেই জগতে ?

—যে কাজ জানি সেটাই করছি। অ্যাক্‌সিডেণ্ট হয় বলে লোকে মোটর হাঁকাবে না ?

এত দরদ এত সহানুভূতি নিজের বাড়ীতে এবং এই পরের বাড়ীতেও ! তবু যেন আর প্রাণটা ভরতে চায় না কেশবের। কেমন বিস্বাদ হয়ে যায় সব কিছু।

বাড়ী যাওয়ার সময় যেন ওজন আরও বেড়ে গেছে মনে হয় বিষাদ ও অবসাদের। আরও নিঝুম হয়ে গেছে বোসপাড়া, ঘরে ঘরে জীবনকে গুটিয়ে নিয়েছে মানুষ। কিসের টানে সে ছুটে এসেছিল ব্যাকুল হয়ে ? এত শান্ত ও রিক্ত চারিদিকের জীবন এখানে। এই বিষাদ আর অবসাদ নিয়ে সহজে ঘুম আসবে না, ভো'তা রাত্রি জেগে শুনবে ঝিঁ'ঝির ডাক।

খেয়ে উঠে কেশব নিজের ঘরে যায়। ঘরেরটি ছাড়া বাড়ীর অন্য আলো এরং শরতের বাড়ীর আলো প্রায় এক সময়েই নিভে যায়।

আলো হয় তো জ্বালা আছে কোন কোন বাড়ীর ঘরে কিন্তু

সে আলো জ্বলছে অন্য প্রয়োজনে, তার মত ঘুম আসে না বলে অগত্যা কিছু পড়ার জন্য আলো জ্বালিয়েছে কজন ?

জঙ্গলের দিকের জানালার বাইরে থেকে মায়ার চাপা গলার কথা শুনে কেশব চমকে যায় !

—শুনছ ? একটা কথা শোন ?

—মায়া ? তুমি ?

—আলোটা নিভিয়ে দাও।

কেশব আলো নিভিয়ে জানলার কাছে সরে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে, তুমি এই জঙ্গল দিয়ে একা এলে ?

—কি করব ? তুমি তো রাত থাকতে উঠে কাজে চলে যাবে।

—কাল আমার ছুটি। তোমার ভয় করল না ?

—করল বৈকি। বড় ভয় দিয়ে ছোট্ট ভয় ঠেকিয়ে চলে এলাম। কেশব একটু ভেবে বলে, ঘরে আসবে ? না আমি বাইরে যাব ? মায়া বলে, তুমি যা বল।

—থাক, আমিই আসছি। কে কোন্ ঘর থেকে দেখে ফেলবে ঠিক নেই। আমায় যেতে দেখলে ভাববে ঘাটে যাচ্ছি।

খিড়কি খুলে কেশব বেরিয়ে যায়! কিছু তফাতে সরে গিয়ে তেঁতুল গাছটার তলায় গাঢ় অন্ধকারে তারা দাঁড়ায়।

—কি ব্যাপার মায়া ?

—আমি থাকতে পারলাম না। আমার দম আটকে আসছিল। আমায় কথা দাও এ কাজ তুমি ছেড়ে দেবে।

টের পাওয়া যায় মায়া কাঁদছে।

কেশব নিশ্বাস ফেলে বলে, তুমি এত অস্থির হচ্ছ কেন ? গাড়ী মেরামত হতে গেছে, কাল দিনটা আমার তো ছুটি।

কান্না থামিয়ে মায়া বলে, ও!

তারপর উদ্বেগের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করে, তুমি বিরক্ত হলে মনে হচ্ছে?

—পাগল! তুমি আমাকে অবাক করে দিয়েছ। চলো তোমায় এগিয়ে দিয়ে আসি।

আবছা ভোরে কেশব পুকুরে গিয়ে নেয়ে উঠে ঘাটে দাঁড়িয়ে পা মুছছে, মায়া একটা গ্লাস হাতে করে এসে বলে, চট করে চুমুক দিয়ে খেয়ে ফেল।

গ্লাসে এক পোর বেশী দুধ।

—এ আবার কি ব্যাপার?

—যে গাইটা বিইয়েছিল, আজ থেকে তার দুধ খাওয়া হবে। রোজ খানিকটা টাটকা দুধ খেতে হবে তোমায়।

কেশব বলে, সে তো বুঝলাম, কিন্তু দুধ কম পড়লে বাড়ীতে কি বলবে?

মায়া হেসে বলে, কত খেয়াল রাখছে বাড়ীর লোক। গাইটাও তো দুইতে হবে আমাকেই! খেয়ে নাও, কে কোথা থেকে দেখবে।

অগত্যা দুধের গ্লাসে কেশবকে চুমুক দিতে হয়। বাচ্চা বাছুর, দুধ খুব পাতলা। কিন্তু ঠিক সে জন্য যেন নয়। মায়ার এই গায়ে পড়ে দরদ করার জন্যই যেন তার লুকিয়ে আনা দুধটা বিশেষ রকম বিস্বাদ লাগে কেশবের কাছে।

—এত ভোরে নাইছ কেন?

—সহরে যাব।

—আজ না তোমার ছুটি?

—অন্য কাজে যাব।

এটা বানানো কথা। কেশবের কাজ কিছুই নেই।

ভিতরটা অস্থির হয়ে উঠেছে সহরে যাবার জন্য তাই কেশবকে যেতে হবে। সে অনুভব করে ভিতরে কি যেন প্রচণ্ডভাবে চাপ দিচ্ছে, মনে হচ্ছে পাগলের মত ছুটে চলে যায় লেভেল ক্রসিং পেরিয়ে সহরের দিকে। কর্মব্যস্ত সহরের কলরব কানে না এলে, দামী ফুলের বাগান ও লনের ধারে গ্যারেজের পাশে তার পরিচ্ছন্ন ঘরখানায় বসে বাড়ীর ভিতর থেকে ললনার গানের সুর ভেসে আসা না শুনলে তার যেন দম আটকে যাবে।

কিন্তু কেশব জানে, সারাদিন পর আবার সে পাগল হয়ে উঠবে আলোকোজ্জ্বল সহর থেকে এই অন্ধকার বোসপাড়ায় ফিরে আসার জন্য। লেভেল ক্রসিংএর দুটি দিক পাল্লা করে তাকে কাছে টানবে আর দূরে ঠেলে দেবে।

ধাত

একটা নতুন বাড়ী উঠছে সহরতলীতে। খাস সহরে স্থানাভাব হলেও আনাচে কানাচে এবং সহরের আশে পাশে বাড়ী তো উঠছে কতই। কাঠা তিনেক জমিতে ছোটখাট এই দোতলা বাড়ীটা কিন্তু উঠছে আমাদের গল্পের জন্য।

বাড়ীটা উঠছে তরুণী অমলার, বিনোদের টাকায়। নিজের আপিসে প্রায় বিনা খাটুনিতে একটা চাকরী তাকে বিনোদ দিয়েছে। কিন্তু অমলা জানে রূপ যৌবন আজ আছে কাল নেই। বিনোদের আপিসের চাকরী আরও অনিশ্চিত, বিনোদ যখন খুসী যাকে খুসী বিদায় করে। তার চাকরী করার ছ'মাসের মধ্যে তিনজনকে সে ছাঁটাই করেছে, তার মধ্যে দু'জন পুরানো লোক।

অথচ এদিকে একটা মুখোস আছে প্রেমের, নগদ টাকা নেওয়া যায় না! মুখোসটা তারা দু'জনেই বজায় রেখেছে নিজের নিজের সুবিধার জন্য। বাড়ী নেওয়া যায়! অন্যলোকের এত বাড়ী তৈরী করে দিয়ে দিয়ে বিনোদ ফেঁপে যাচ্ছে, তাকে একটা ছোটখাট বাড়ীই করে দিক। সকলকে নিয়ে মাথা গুঁজবার স্থায়ী একটা ঠাঁই, নিশ্বাস ফেলে ফেলে মাসে মাসে ভাড়া গোণা থেকে রেহাই।

ভিতের পর গাঁথনি সুরু হয়ে গেছে। রাজমিস্ত্রী খাটছে দু'জন, সাদেক আর পণ্ডিত। সাদেক পাকা রাজমিস্ত্রী, এটাই তার বংশগত পেশা। বিনোদের ফার্মের সে বাঁধা লোক। এরকম ছুটকো বাড়ী গাঁথার

কাজে বিনোদ তাকে সাধারণত লাগায় না, কিন্তু অমলার কথা ভিন্ন।

ভাল মাল মশলা আর ভাল মিস্ত্রী দিয়ে বাড়ীটা না করে দিলে অমলা অভিমানের ছলনায় ঝন্‌ঝাট বাড়াবে।

পণ্ডিত ক'বছর আগেও মজুর খাটত। মশলা মেশাবার কাজে সে ছিল ওস্তাদ। যুদ্ধের পর বেড়ে গেছে বাড়ী করার হিড়িক। যুদ্ধের সময়কার কাঁচা পয়সা এবং ঘুষ ও চোরাবাজারের পয়সার নামে বেনামীতে বাড়ীর রূপ নেবার ঝোঁকের সঙ্গে যোগ হয়েছে পাকিস্তান থেকে ব্যবসা গুটিয়ে ভিটেমাটি বেচে চলে আসা মানুষগুলির সবার আগে একটা ভিটের ব্যবস্থা করার ঝোঁক।

বাড়ীর জন্য এমনি প্রাণে খাঁ খাঁ করে এদের যে তৈরী বাড়ী কিনতে পেলে যেন বর্তে যায়। বিনোদের মত মানুষেরা এটা কাজে লাগাতে কসুর করে নি। সে একাই ওঁচা মাল আর পচা মশলা দিয়ে চটপট যেমন তেমন করে গেঁথে তোলা বাড়ী বেচে ওরকম সাতজন বাড়ী-পাগল মানুষের সম্বলে মোটা ভাগ বসিয়েছে।

ওই বাড়ীগুলি গাঁথবার সময় বড়ই সে বিরক্ত হয়েছিল সাদেকের উপর।

ঃ তোমায় বার বার বলছি অত নিখুঁত কাজে আমার দরকার নেই, স্পিড বাড়িয়ে দাও, চটপট্ তুলে দাও—কিছুতে তুমি কথা শুনবে না!

ঃ ওরকম কাজ করতে শিখিনি বাবু। যেমন শিখেছি, তেমনি কাজ করছি।

পাকাপোক্ত বাড়ীও গেঁথে দিতে হয় হিসেবী পাকা লোকের শ্যেনদৃষ্টির সামনে, সাদেককে তাই বিনোদ ছাড়তে পারে নি।

রাজমিস্ত্রীর ওই চাহিদার সময় মোটামুটি কাজ শিখেই পণ্ডিত

হয়েছিল রাজমিস্ত্রী। সাদেকের সঙ্গে পাল্লা দিতে না পারলেও কাজ পণ্ডিত ঠিক মতই করে যায়। সাদেকের চেয়ে সে বরং তাড়াতাড়ি কাজ এগিয়ে দিতে পারে, যদিও গাঁথনি হয় একটু কম মজবুত।

পণ্ডিত তার আসল নাম নয়। পাণ্ডিত্য বা পণ্ডিতের বংশে জন্মানোর জন্য তার এ নাম হয় নি। পণ্ডিতদের মতই সব বিষয়ে সব প্রশ্নের যেমন হোক একটা মানে করে দেয় বলে কে একজন তামাসা করে তাকে পণ্ডিত বলে ডাকতে সুরু করেছিল, সকলের কাছে তার এখন এটাই নাম দাঁড়িয়ে গেছে।

এখনো ভারা বাঁধার দরকার হয় নি, দেয়াল এখনো কোমরের নীচে। নীচে দাঁড়িয়েই মশলা ঢেলে ইট সাজানো যায়। ভগলু বালতি করে জল এনে ইট ভিজিয়ে দেয়, জগদেও মশলা মেখে কড়াইতে ভরে। মাথায় করে ইট আর মশলার কড়াই নিয়ে টিকিন মিস্ত্রীদের যোগান দেয়। ছোকরা রাখাল খাটে ফুটফাট ফরমাস।

এদের টাইমের কাজ। রতন আর জগন্নাথ সকাল সকাল এসে ইট ভেঙ্গে ছোটবড় খোয়া করতে লেগে যায়—সারাদিন তাদের হাতুড়ি দিয়ে ইট ভাঙ্গা চলে, রোদ চড়লে খোয়ার স্তূপে একটা শিক ঢুকিয়ে মাথার উপর ছাতি বেঁধে নেয়। তাদের চুক্তির কাজ। কয়েকদিন খোয়া ভাঙ্গার পর এক ফুট উঁচু আর চারকোণা করে সাজিয়ে দেবে, মাপজোক হবার পর স্কোয়ার ফুট হিসাবে মজুরি পাবে।

হরে দরে টাইমের মজুরদের সমানই দাঁড়ায় তাদের মজুরি।

টিকিনের মাথায় রাশিকৃত চুলের মস্ত খোঁপা, হাতে মোটা মোটা রূপার বালা এবং সারা দেহে নানা প্যাটার্নের উল্কির নক্সা কাটা।

টিকিন পণ্ডিতের সঙ্গে থাকে। এই বয়সের যুবতী মেয়ের পক্ষে একজন পুরুষের সঙ্গে থাকাই নিয়ম। একা থাকতে চাইলে তার

মানে দাঁড়াবে যে সে দশটা পুরুষের সঙ্গে বজ্জাতি করার স্বাধীনতা চায়, বেশ্যা হয়ে যেতে চায়। তা সে খুসী হলে হতে পারে কিন্তু যথা নিয়মে দেহের দোকান খুলতে হবে, দশজনের সঙ্গে খেটে খাওয়ার সম্মান বজায় রাখা চলবে না। আরও দশটা মেয়ে তো খেটে খাচ্ছে, বাচ্চা কাচ্চার ঝামেলা পোয়াচ্ছে, তাদের সাথে থেকে তাদের মরদদের সঙ্গে খেলা করার অধিকারও টিকিনের থাকলে চলবে কেন? নিয়ম তো থাকা চাই সংসারে। একজন পুরুষের সঙ্গে থাকলে সে তাকে সামলে রাখবে, বেইমানী করতে দেবে না।

একজনের সাথে বনিবনা না হলে ছাড়াছাড়ি হবে, আরেকজনের কাছে যাবে। কিন্তু তাকে থাকতেই হবে একজন পুরুষের সঙ্গে।

পণ্ডিত অবশ্য তাকে খাটতে না দিয়ে পুষতে পারে—বৌয়ের মত। বিয়ে করা বৌটা বেঁচে থাকলে সে যেমন আর খাটতে যেত না, ঘরে রেখে তাকে পুষতে হত। স্বামী স্ত্রীতে খাটা অবশ্য নিষিদ্ধ নয় মোটেই। ভগলু জগদেও রতন জগন্নাথ সকলের বৌ ঘর ছেড়ে খাটতে যায়, কেউ টাইমের কেউ ঠিকা কাজে।

কিন্তু পণ্ডিতের হল রাজমিস্ত্রীর রোজগার, তার বিয়ে করা বৌ বাইরে খাটতে যেতে রাজী হবে না, বৌকে খাটাবার অধিকারও তার নেই।

এবং ঠিক এইজন্যই টিকিনকেও সে জোর করে বলতে পারে না যে তোর খাটতে গিয়ে কাজ নেই, আমি তোকে ঘরে রেখে পুষব।

টিকিন নিজেই রাজী হবে না।

স্বেচ্ছায় সে পণ্ডিতের সঙ্গে আছে। অন্য পুরুষ নিয়ে বেইমানী করা ছাড়া, পণ্ডিতের বেশী রোজগারে ভাগ বসানোর জন্য খানিকটা বাধ্যবাধকতা ছাড়া, খুসীমত চলা-ফেরার অধিকার, যখন ইচ্ছা পণ্ডিতকে

ছেড়ে যাবার অধিকার পুরোমাত্রায় বজায় আছে।

শাস্ত্রমতে আইনমতে বা প্রথামতে বিয়ে করা বৌ ঘরে বসে খেলেও তার কতগুলি বিশেষ অধিকার থাকে। পোষা হয়ে থাকলে কিন্তু টিকিন বিয়ে করা বৌয়ের এই বিশেষ অধিকারগুলিও পাবে না, নিজের বিশেষ অধিকারগুলিও হারাবে। পণ্ডিতকে যখন খুসী ছেড়ে যাবার অধিকার পর্য্যন্ত সে হারিয়ে বসবে।

ছাড়তে চাইলেই পণ্ডিত বলবে, অ্যাদ্দিন যে পুষেছি, সেটা শোধ দিয়ে যাবি!

তবু জোর করে যেতে চাইলে পণ্ডিত যদি তার বালা থেকে গায়ের কাপড় পর্য্যন্ত কেড়ে নিয়ে ঘাড়ে ধরে রাস্তায় ঠেলে দেয়, লোকে তাকে দোষ দেবে না!

বলবে, ঠিক করেছে। এতদিন ঘাড় ভেঙ্গে খেয়ে পরে আরামে থেকে আজ মাগী বেইমানী করচে!

বৌকে টাইমে খাটতে পাঠায় যে ভগলু, সেও হয় তো রেগে গিয়ে থুতুর সঙ্গে মুখের খৈনীটা পর্য্যন্ত ফেলে দিয়ে বলবে, তেরা সরম নেহি লাগতা? কুত্তী সে ভি নীচা হো গিয়া?

সবাই সায় দেবে তার কথায়। সবাই জেনে যাবে মানুষের সব চেয়ে বড় দোষটা আছে টিকিনের মধ্যে, সে নিমকহারামি করে!

সাপের মত, যে তাকে পোষে তাকেও সে সুযোগ পেলে দংশায়।

কাজের তদারক করে আর দিনান্তে মিস্ত্রী মজুর মজুরনীর মজুরি মিটিয়ে দেয় কার্ত্তিক। বিনোদের কি রকম এক বোনের সে ছেলে, একটা পা তার একটু বাঁকা, চেরা ঠোঁটের জন্য পান-রাঙা বড় বড় দাঁতগুলি সর্ব্বদা বেরিয়ে থাকে। সম্পর্কের হিসাবেই সে বিনোদের

আশ্রয়ে থাকে কিন্তু বিনোদ কাউকে বিনামূল্যে আশ্রয় দেওয়ার মানুষ মোটেই নয়,—খাওয়াপরা মাথা গুঁজে থাকার ভাড়া সব কিছুর অনেক বেশী দাম কার্ত্তিককে খাটিয়ে তুলে নেয়।

খানিক তফাতের আমগাছটার ছায়ায় বসে সে তাদের কাজ ছাখে, বিড়ি টানে, ঝিমায়, কুকারের বাটিতে আনা রুটি তরকারী খেয়ে লম্বা ঘুম দেয়, আজ এ বাড়ী কাল ও বাড়ী থেকে খবরের কাগজ চেয়ে এনে পড়ে।

কাজের ফাঁকে টিকিন গিয়ে আব্দার জানায়, একটো বিড়ি হোবে বাবু?

কার্ত্তিক তাকে একটা বিড়ি দিয়ে জিজ্ঞাসা করে, তোমাদের ঝগড়া হচ্ছিল কেন?

ঃ ঝগড়া? ঝগড়া কেনে হোবে? পণ্ডিতের সাথমে কথা বলছিনু।

ঃ তুমি পণ্ডিতের বৌ না?

টিকিন খিলখিলিয়ে হাসে। দেখা যায় কার্ত্তিকের পান-রাঙা দাঁতগুলির চেয়ে ঢের বেশী ঘন গাঢ় রঙ টিকিনের দাঁতে। মিশিতে কুচ-কুচে কালো হয়ে আছে দাঁতগুলি। ঠিক যেন সাজান কালো দু'সারি মুক্তা।

টিকিন টের পায় কার্ত্তিক তার মুখ দেখবে না দেহের গড়ন দেখবে ঠিক করতে পারছে না। সে কাছাকাছি চোখের সামনে এলেই কার্ত্তিক এ রকম করে, ঠিক যন্ত্রের মত বাঁধা নিয়মে খানিক মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে সর্ব্বাঙ্গে একবার চোখ বুলিয়ে যাবে। কিন্তু কাচুমাচু করে না, তার শান্ত বিষণ্ণ উদাস ভাবটাও ঘোচে না। সে শুধু যেন একটু অবাক হয়ে গেছে। বড় ভাল ছোকরা, গাছতলায় বসে তাদের কাজ দেখে, শেষবেলায় কাজের শেষে যার যা পাওনা

মিটিয়ে দেয়—বাসভাড়া বিড়ি সিক্রেট ক্যাশবাবুর সেলামী তার নিজের সেলামী এসব কোন বাবদে দুটো পয়সাও সে কোনদিন কাটে না কারো মজুরি থেকে।

পণ্ডিত ধীরে ধীরে সুর করে যে পুথি পড়ে, সেই পুথিতে যে যোয়ান বয়সী ঋষির ছেলের কথা আছে কার্ত্তিক যেন চালচলন ভাবেসাবে সেই রকম—শুধু চেহারা তার বিচ্ছিরি।

বিড়ি ধরিয়ে টিকিন বলে, রোজ নাই মিলেছে। আজ মিলবে তো ঠিক ?

কার্ত্তিক নোংরা ন্যাকড়ায় নস্য দেওয়া নাক ঝেড়ে বলে, আমি কি রোজ দেবার মালিক ? আজও সঙ্গে টাকা দিয়ে দেয় নি, পিয়ন দিয়ে টাকা পাঠিয়ে দেবে বলেছে। টাকা এলে পেয়ে যাবে।

: দু'রোজ তো পিয়ন না এল ? আজ যদি নাই আসে ? ই কি রকম মজা হল বাবু!

কার্ত্তিক কোন কথা না বলে শুধু মুখ বাঁকায়। মুখ বাঁকালে মুখটা আরও কুৎসিৎ দেখায়।

টিকিন গজর গজর করতে করতে ফিরে যায়। জীর্ণ পুরাণো যে বাড়ীটার পাশে নতুন বাড়ীটা উঠছে তার চুণবালি খসা দেওয়ালটার ছায়ায় হাঁটু মুড়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে আরাম করে বসে আঁচলে বাঁধা শুকনো পান আর তামাক পাতা মুখে ছেড়ে দেয়।

সাদেক হেঁকে বলে, ইটা লাও, জলদি—

পণ্ডিত বলে, আরে হেই, মশলা ?

টিকিন হাই তুলে ভগলুকে বলে, পিয়ন রূপেয়া লিয়ে আসবে তবে আজ রোজ মিলবে ভগলু!

সাদেক বলে, রোজ আলবাৎ মিলেগা। ইটা লাও।

কিন্তু টিকিনের ধাতের সঙ্গে যেন কাপে মেলানো মরদগুলির ধাত।

পণ্ডিত হাই তুলে বলে, পানি পিয়েগা, পিয়াস জানাতা।

বলে দেড় হাত উঁচু নতুন গাঁথা দেওয়ালের মায়া কাটিয়েই সে টিকিনের পাশে জীর্ণ পুরাণো দেয়াল ঘেঁষে বসে চোখ বোজে।

বালতির জলে হাত পা ধুতে ধুতে ভগলু ভাঙা গলায় গান গেয়ে উঠবার চেষ্টা করে।

জগদেও বলে, বহুত আচ্ছা ওস্তাদজি!

সমতল চৌকোণ করে সাজানো খোয়ার স্তূপের খানিক তফাতে রতন জগন্নাথ ছোট খোয়া ভাঙছিল—কাজ যদি ঠিকমত চলে, দেয়াল গেঁথে উঠে ছাত গাঁথার প্রয়োজন খুব বেশী দূরভবিষ্যৎ নয়। টিকিন সাদেক পণ্ডিতদের মত তাদেরও হাত যেন শিথিল হয়ে আসে।

তারাও উঠে গিয়ে বসে পড়ে দেওয়ালের ছায়াতে। ডিব থেকে বিড়ি বারকরে রতন সাদেককে একটা বাড়িয়ে দিয়ে বলে, মেচিস্ হায়?

সাদেক দেশলাই জ্বালে। একটা কাটিতে বিড়ি ধরে পাঁচটা!

খেদের সঙ্গে সাদেক বলে, বড়া লুচ্চা বেইমান বিনোদবাবু। খালি মতলব, খালি মতলব!

তাদের দিকে তাকিয়েই যেন এতক্ষণে কাত্তিকের ঘুম পেয়ে যায়। মাথার নীচে হাত রেখে সে সটান চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে!

সূর্য্য মাথার উপর থেকে পশ্চিমে ঢলে পড়ে অনেকটা। আকাশে রূপার চাক্তির মত লেপ্টে আছে চাঁদ, একটা দিকে একটুখানি কাটা। টিকিন একটা কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে বসে মরদগুলিকে।

সূর্য্য কেবল দিনের বেলা আকাশের অধিকার পায় চাঁদ কেন

রাতেও ওঠে দিনেও ওঠে ?

পণ্ডিত সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিতের মতই ব্যাখ্যা করে বলে, চাঁদ সূরযকা বহু এই সিধা বাত তুম জানতা নেহি ? দিনভর খাটকে রাতমে সূরয নিদ যাতা, রাত ভোর মজা লুটতা মেরে চাঁদ বিবি। দিনমে আকাশি পর উঠকে দেখাতা যে মায় খাঁটি হ্যায় সূরয দেওকা সাচ্চী পত্নী হ্যায়।

টিকিন খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে।

সেই হাসির সঙ্গে বড়ই বেসুরো বড়ই বেমানান ঠেকে অমলার ধমকের সুরে উদ্বেগ-কাতর প্রশ্ন ঃ তোমরা কাজ করছ না কেন ?

টিকিন বলে, দিন মজুরকো রোজ না মিলনেসে কেইস্তা খাটেগা মাইজী ? হাওয়া খায়েগা ?

মাইজী ! অমলা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে টিকিনের দিকে তাকায়। একবারের বেশী দু'বার তাকাতে হয় না, দেখলেই টের পাওয়া যায় টিকিনের ছেলেপিলে হবে—তিন কি বড় জোর চার মাসের মধ্যেই।

কিন্তু তার তো মোটে তিন মাস—অনেক হিসাব করে দেখেছে, তিন মাসের বেশী তার হতেই পারে না—তাকে দেখে কি টের পাওয়া যায় সেও মা হবে ? নইলে মাইজী বলে কেন !

অমলা তীক্ষ্ণস্বরে ডাকে, কাত্তিক !

কার্ত্তিক ধড়মড় করে উঠে আসে।

ঃ এদের রোজ দিচ্ছ না কেন ?

ঃ ক্যাশবাবু টাকা না দিলে আমি কি করব ? বলেছে পাঠিয়ে দেবে।

অমলা চুপকরে দাঁড়িয়ে থাকে। কালের চেয়ে আজ আরও বেশী শুকনো দেখাচ্ছে তার মুখ। কাল ছিল না, আজ যেন কালিও পড়েছে চোখের কোণে।

এই গরমে পাঞ্জাবীর উপর ভাজ করা করা সাদা চাদর কাঁধে মাঝ-বয়সী মোটাসোটা ভদ্রলোকটিকে সাথে নিয়ে স্বয়ং বিনোদ গাড়ী নিয়ে হাজির হলে অমলার কালি-পড়া চোখে আগুনের ঝিলিক খেলে যায় কিন্তু মুখে কথা সরে না।

এই লোকটিকে কয়েকদিন ধরে বিনোদের কাছে যাতায়াত করতে দেখেছে। আজ ওকে সাথে নিয়ে এখানে আসতে দেখে অমলার বুঝতে কিছুই বাকী থাকে না।

একটা দাও পেয়েছে বিনোদ। তৈরী বাড়ী তার হাতে নেই একটাও, অমলার জন্য এ বাড়ীটা তবু খানিকটা তৈরী হয়ে আছে!

তাকে দেখে বিনোদ বিরক্ত হয়ে বলে, তুমি এখানে কি করছ?

অমলা নিশ্বাস ফেলে ঢোক গেলে।

এমনি এসেছিলাম।

আধঘণ্টা পরে অমলা আর কার্ত্তিক বিনোদের সঙ্গে গাড়ীতে চলে যায়, চাদর দিয়ে মুখের ঘাম মুছে ভদ্রলোক তাদের বলে, তোমরা বইসা রইছ ক্যান? কাম করবা না?

সাদেক বলে, দু'রোজের মজুরি মেলে নি।

ততক্ষণে কোথায় কতদূরে চলে গেছে বিনোদের গাড়ী, তবু দাঁত মুখ খিঁচিয়ে সেইদিকে চেয়ে ভদ্রলোক বলে, হারামজাদা ডাকাইত! মজুরি পর্য্যন্ত বাকী থুইছে!

তারপর মুখ ফিরিয়ে আবার চাদর দিয়ে মুখের ঘাম মুছে ভদ্রলোক বলে, কাম কর, আমি তোমাগো মজুরি দিমু।

পেটের সাত মাসের সন্তানের ভার সামলে উঠতে গিয়ে পণ্ডিতের মুখেরদিকে চেয়ে মিশমিশে কালো দাঁত বার করে টিকিন হাসে।

ঠাঁই নাই ঠাঁই চাই

দেবানন্দ প্রথমে তাদের দায়িত্ব ঘাড়ে নিতে কিছুতেই রাজী হতে চায় নি।

তার নিজের ঘাড়ের বোঝাটাই কম নয়। রোগা দুর্বল স্ত্রী, একটি বিবাহিত ও একটি কুমারী মেয়ে, দুটি অল্প বয়সী ছেলে এবং একটি শিশু নাতি। যে অবস্থায় যে-ভাবে এদের নিয়ে বিদেশ যাত্রা, তার ওপর একজন বিধবা ও তার বয়স্কা মেয়েকে সাথে নিতে সত্যই তার সাহস হয়নি।

শোভার মা জোর দিয়ে বলেছিল, আপনার কোন দায়িত্ব নাই। আমাগো খালি সাথে নিবেন। আমি টিকিট কাটুম, ভিড় ঠেইলা আপনাগো লগে রেল ষ্টিমারে উঠুম।

তা কি হয়?

হইব না ক্যান? আপনারা না গেলে মাইয়ার হাত ধইরা রওনা দিতাম না?

না, বোঝা হয়ে তাদের ঘাড়ে চাপতে চায় না শোভা ও শোভার মা। পথে কোন সাহায্য বা সহায়তারই দাবী তারা তুলবে না। কথাটা শুধু এই যে, দুটি মেয়েলোক পুরুষ অভিভাবক ছাড়া একলা চলেছে এটা টের পেলেই চোর ছ্যাঁচড় বজ্জাতরা বড় বেশী পিছনে লাগে। দেবানন্দের সঙ্গে গেলে এই দুর্ভোগ থেকে তারা রেহাই পাবে।

তখন দেবানন্দ তার আসল দুর্ভাবনা ব্যক্ত করেছিল। বলেছিল সাথে নয় গেলেন। কলকাত্তা পৌঁছাইয়া কই যাইবেন? সংবাদ শুনি,

শহরের ফুটপাতে তিল ধারনের ঠাঁই নাই। আমি নিজে কৈ যামু কি করুম জানি না। আপনারে নিয়া বিপদ বাড়ামু ?

আমাগো ঠাঁই আছে।

শোভার মা নাকি কলকাতায় ছোটখাটো একখানা বাড়ীর অর্ধাংশের মালিক। বাড়ীটা হয়েছিল শোভার বাবা আর জ্যাঠামশাই ঘনশ্যামের নামে। দেশের জমিজমা ঘরবাড়ী দেখার জন্য শোভার বাবা দেশেই থেকেছে বরাবর, জ্যাঠা থেকেছে কলকাতার বাড়ীতে। মাঝে মাঝে কয়েকদিনের জন্য কলকাতা বেড়াতে গিয়ে তারা ওবাড়ীতে বাসও করেছে কয়েক বার।

তবে শোভার বাবা মারা যাওয়ার পর গত ছ'সাত বছর শোভার জ্যাঠাও তাদের খোঁজখবর নেয় নি, তারাও অভিমান করে নিজেদের কোন খবর দেয়নি শোভার জ্যাঠাকে।

কিন্তু এখন তো আর অভিমান করে বসে থাকার উপায় নেই। বয়স্থা মেয়েকে নিয়ে কলকাতা যেতেই হবে।

ঘনশ্যামকে চিঠি দিয়েছিল। জবাবে ঘনশ্যাম তাদের যেতে বারণ করেছে। ভয় দেখিয়ে লিখেছে যে, বারণ না শুনে গেলে তারা বিপদে পড়বে। কিন্তু—তাতো আর হয় না। ঘনশ্যাম তাদের খেতে দিক বা না দিক—বাড়ীতে মাথা গুজতে না দিয়ে তো পারবে না! পেটের ব্যবস্থা কি হয় না হয় সেটা পরে দেখা যাবে।

দেবানন্দের দুর্ভাবনা ও আপত্তি তখন হ্রাস পেয়েছিল, ওদের যখন মাথা গুজবার ঠাঁই আছে, একেবারে একটা বাড়ীর অর্ধাংশের মালিকানা স্বত্বে, তখন আর ওদের সঙ্গে নিতে বিশেষ ভাবনার কি আছে ?

হয় তো ওদের বাড়ীর অংশে দু'চারদিনের জন্য তারাও আশ্রয় পেতে পারে।

তা ছাড়া শোভার মা তেমন দুর্বলা নয়—শোভাও বুঝি নয়। প্রতিবেশিনী হিসাবে শোভার মা দেবানন্দের সামাজিক অভিভাবকত্ব ঘোষনা করেছে দশ জনের কাছে—কিন্তু নিজেও কখন তার কাছে ঘেঁষেনি বা তাকে কাছে ঘেঁষতে দেয়নি। সামাজিক অভিভাবকের সঙ্গে পরামর্শের দরকার হলে বরাবর মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে তার কাছারি ঘরে এসেছে,—সকালবেলা, সে যখন সরকার গোমস্তা আর পাঁচজন প্রজাকে নিয়ে বিষয়কর্মে ব্যস্ত। ঘোমটা টেনে খানিক তফাতে দাঁড়িয়ে শোভাকে মাঝখানে মধ্যস্থ রেখে শোভার মা তার সঙ্গে কথা বার্তা বলেছে।

গোড়ার দিকে বিবেকের উপরোধে মাত্র দু'একবার অভিভাবকের দায়িত্ব জাহির করতে বাড়ী বয়ে খবর নিতে গিয়েছিল। শোভা পর্যন্ত সামনে আসেনি। দরজা একটু ফাঁক করে শুধু মুখখানা বারকরে বলেছিল, কষ্ট কইরা আপনার আসনের কাম কি? আমাগো দরকার পড়লে আমরা কমু গিয়া।

অত্যন্ত অপমান বোধ হয়েছিল দেবানন্দের।

তোমাগো যাওনের বা কিছু কওনের দরকার নাই।

দরজার ফাঁকে দেখা গিয়েছিল শোভার মুখ। সে মুখে কথা জুগিয়ে ছিল কানের পিছনে শোভার মার মুখ। বোধ হয় দুবার তিনবার শুনবার পর শোভার মুখে মুখস্ত কথা বলেছিল: আপনে বোঝেন না। আপনে আইলে লোকে বদনাম দিব।

তাতে আরও অপমান বোধ হয়েছিল দেবানন্দের।

কিন্তু অপমান-বোধ বাধ্য হয়েছিল শ্রদ্ধায় স্বীকৃতি দিয়ে তলিয়ে যেতে। শোভার একমামা এসে হয়েছিল হাজির। বোনের এবং ভাগ্নীর অভিভাবক হবে, জমিজমা ঘর পুকুরের মালিক হবে!

দেবানন্দের কাছারি ঘরে একটা সামাজিক ব্যাপারের ছুতায় রাজনৈতিক অবস্থা ও ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনার জন্য জন দশেক স্থানীয় বিশিষ্ট লোক জমায়েৎ হয়েছিল—মেয়েকে সামনে ধরে শোভার মা সেইখানে হাজির।

শোভার মুখ দিয়ে নয়, শোভাকে সামনে রেখে নিজের মুখে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছিল যে সে বিপদের প্রতিকার চাইতে এসেছে। দেবানন্দকে বাপ ধরে নিয়ে সে পুরুষ অভিভাবক ছাড়াই মেয়েকে মানুষ করছে, সব কাজ কারবার দেখাশোনা বিলি ব্যবস্থা করে আসছে। হঠাৎ একজন আত্মীয়তার অজুহাতে এসে তার ঘর দুয়ার দখল করে তাদের পথে বসাবার চেষ্টা করবে, এটা সে বরদাস্ত করবে না।

একজন বলেছিল, কেডা আইছে গো—গোবর্ধন? সে না শোভার মামা?

বুড়ো হরিনারায়ণ চমকে উঠে বলেছিল, মায়ের পেটের ভাই না তোমার?

ভাই? একযুগ বইনের খবর নেয় নাই, সেও ভাই? চোরডাকাতে রাতে সিঁদ কাটে, হানা দেয়। বইনের কেউ নাই জাইনা দিন দুপরে দশজনেরে জানান দিয়া ভাই হইয়া বইনের সব লুটবার আইছে। সেও ভাই? ভাই দিয়া আমার কাম নাই, মাইয়ার কাম নাই মামা দিয়া। যাইতে কই, যায় না। আপনারা বিহিত করেন।

বিহিত তাদের করতে হয়েছিল শোভার মামাকে ভাগিয়ে দিয়ে। দেবানন্দ টের পেয়েছিল, শোভার মার বুকের পাটা শক্তই আছে।

শিয়ালদহ নেমে চারিদিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ তারা স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বিবরণ আগেই শুনেছিল, কিন্তু এত মানুষ এইটুকু

জায়গায় এভাবে গাদাগাদি করে দিনরাত কাটাতে পারে, চোখে দেখার আগে এটা কল্পনা করা সম্ভব ছিল না। মনে হয়, কটা পিঁজরাপোলীয় হাসপাতাল যেন গড়ে তুলেছে জগতের পরিত্যক্ত মানুষ—কচি শিশু থেকে শেষ বয়সের মেয়ে পুরুষ।

পৃথিবীতে এত অনটন ঘটেছে স্থানের?

শোভার মা বলে, বাবা, আপনারা কই গিয়া উঠবেন?

দেবানন্দ বলে, তোমাগো আগে পৌঁছাইয়া দিয়া আসি—ফিরা আইসা ঠাঁই খোঁজনের চেষ্টা করুম।

মনুষ্যত্বের এই পিঁজরাপোলে সকলকে বসিয়ে রেখে দেবানন্দ তাদের পৌঁছে দিতে যাবে—এই সহজ কথাটা যেন শোভার মা বুঝতে পারে না। সে একটু ব্যাকুল দুর্বোধ্য দৃষ্টিতে দেবানন্দের মুখের দিকে চেয়ে থাকে। পথের বাস্তবতা ঘণ্টা কয়েক সময়ের মধ্যেই দেবানন্দের কাছে তার বহুযুগের ঘোমটার আড়াল প্রায় ঘুচিয়ে দিয়েছে।

শোভা বলে, মা? আমরা দুইখান ঘর পামু না?

শোভার মা চিন্তিত মুখে বলে, সেই কথাই তো ভাবি। দুইখান ক্যান, একখান ঘর পামু সঠিক জাইনা কি চুপ কইরা অছিস ভাবস? যে চিঠি লিখছে তোর জ্যাঠা—।

শোভা বলে, দিব না কও? আমাদের ভাগের ঘর দিব না ক্যান? জোর কইরা দখল করুম।

শোভার ছেলেমানুষি তেজে যেন তার মার সম্বিৎ ফিরে আসে। তার মফস্বলের তেজ ও দৃঢ়তা অনভ্যস্ত অচিন্তিত অবস্থায় এসে পড়ে খানিকটা ঝিমিয়ে গিয়েছিল। সে আর দ্বিধা করে না, দেবানন্দকে বলে, আপনারাও আসেন আমাগো লগে। যে কয়দিন বাসা খুইজা না পান, মাথা গুইজা থাকবেন।

তাকি হয়?

হয়। মা বইন বাপ ভাই আপনাগো ফেইলা আমি গিয়া ঘরে উঠুম? আমি আপনার অমন মাইয়া না।

দেবানন্দের বড় মেয়ে মায়া ছলছল চোখে চেয়ে বলে, বাবা আবার তোমারে সঙ্গে নিতে ডরাইছিল!

তার ছোট বোন ছায়া শোভার দিকে চেয়ে একটু হাসে। আগে তাদের জানা শোনা ছিল, পথের কষ্টকর গাঘেঁষাঘেঁষি ঘনিষ্ঠতায় তারা সখিতে পরিনত হয়ে গেছে।

শোভার মা বলে, আমি তো ডরাই। ভাসুর যা চিঠি লিখছে—রওনা দিতে বারণ কইরা। বিষম নাকি বিপদ হইব। তা মরার বাড়া বিপদ কি?

দেবানন্দ বলে, তোমরা আইসা ভাগ বসাইবা তাই বারণ করছে। ভয় দেখাইয়া যদি ঠেকান যায়।

শোভার মা ধীরে ধীরে মাথা নাড়ে; চিঠির ধরন তেমন না। ওই কু-মতলব থাকলে বানাইয়া দশটা অজুহাত দিত, লিখত যে এই এই ব্যাপার হইছে কাজেই তোমরা আইসো না। কোন কারণ না, কেমন যেন দিশাহারা ভাবে লিখছে চিঠিখান। মনে লাগে, কিছু ঘটছে।

একটা গাড়ী ভাড়া করে তারা রওনা দেয়।

বাড়ীটা সহরের এক ঘিঞ্জি নোংরা প্রান্তে।

কলকাতায় বাড়ী করার আসল দরকারটা ছিল ঘনশ্যামেরই, সহরেই তার স্থায়ী বসবাস। একটু বুদ্ধি খাটিয়ে ভাগাভাগিতে বাড়ী করার প্রস্তাব সে-ই করেছিল শোভার বাবার কাছে—ওরা দেশেই থাকবে বরাবর, মাঝে মাঝে কেবল কিছুদিনের জন্য বেড়াতে আসবে, বাড়ীটা

একরকম সে-ই সপরিবারে ভোগ দখল করবে।

সমস্ত নগদ সঞ্চয় দিয়ে এবং জমি বেচে শোভার বাবা নিজের ভাগের টাকা দিয়েছিল, কলকাতা সহরে একটা বাড়ীর অংশ থাকবে শুধু এইটুকুর জন্য।

আর আজ বিপদে পড়ে সেই ভাই-এর বৌ আর মেয়ে কলকাতা আসতে চাইলে ঘনশ্যাম বিপদের ভয় দেখিয়ে তাদের আসতে নিষেধ করে।

গলির মধ্যে গাড়ী ঢুকবে না। গলির মুখে গাড়ী দাঁড় করিয়ে দেবানন্দ আর শোভার মা গলিতে ঢোকে।

ছোট দোতলা বাড়ীটার সদরের কড়া নাড়তে অল্পবয়সী কালো একটি ছেলে দরজা খোলে। —শোভার মার সে অচেনা!

কাকে চান?

দেবানন্দ বলে, ঘনশ্যাম বাবুরে ডাইকা দাও।

ছেলেটি বলে, ঘনশ্যাম বাবু? তিনি তো এখানে থাকেন না।

শোভার মা বলে, কি কথা কও থাকেন না? তার বাড়ী না এটা?

ছেলেটি মাথা নেড়ে বলে, না। এটা আমাদের বাড়ী, কিনে নিয়েছি।

দেবানন্দ আর শোভার মা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে।

কতদিন কিনা নিছ?

আর বছর।

শোভার মা হতভম্ব হয়ে থাকে। দেবানন্দ হিসাবী বিষয়ী মানুষ, এইটুকু ছেলের সঙ্গে আলাপ করে লাভ নেই বুঝে বলে, খোকা, তোমার বাবারে ডাইকা দিবা?

আমার বাবা নেই। এটা মামার বাড়ী।

মামা বাড়ী আছেন? ওনারেই ডাইকা দাও।

খানিক পরে ভুঁড়িওলা প্রৌঢ় বয়সী কৃষ্ণদাস বাইরে এলে দেবানন্দ জিজ্ঞাসা করে, আপনে এই বাড়ী কিনছেন ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনারা কি চান ?

আমি ঘনশ্যাম বাবুর স্থাশের লোক। ইনি তার ভায়ের বৌ।

কৃষ্ণদাস বলে, তা আপনারাই আসবেন জানিয়ে কার্ড লিখে-ছিলেন ? চিঠিটা আমি তো সঙ্গে সঙ্গে ঘনশ্যাম বাবুর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি ! উনি আপনাদের ঠিকানা জানান নি ?

দুজনেই তারা স্বস্তি বোধ করে। বাড়ী বিক্রী করে দিয়ে থাক, ঘনশ্যামের পাত্তা অন্তত পাওয়া যাবে !

দেবানন্দ বলে, চিঠি লিখেচেন কিন্তু ঠিকানা দিতে ভুলে গেছেন।

প্রকাণ্ড একটা হাঁ করে হাই তুলে কৃষ্ণদাস বলে, ভুলে হয় তো যান নি, ইচ্ছা করেই ঠিকানা জানান নি। মানুষটার বড় দুরবস্থা।

ঘনশ্যামের দুরবস্থায় বিবরণ শুনতে শুনতে দেবানন্দ ও শোভার মা আবার মুখ চাওয়াচাওয়ি করে।

কাজ নেই। রোজগার নেই। রোগে ভুগছে। দেনায় বিকিয়ে গেছে এই বাড়ী। ঘনশ্যামকেও উদ্বাস্তু হতে হয়েছে। ওইখানে উঠে গেছেন—হাত বাড়িয়ে আঙ্গুলের সঙ্কেতে কৃষ্ণদাস গলির আরও ভিতরের দিকে বাঁকের ওপাশে খোলার চালাগুলি দেখিয়ে দেয়। দুটো পাকা বাড়ীর ফাঁকে দু'তিনটে খোলার চালাই শুধু দেখা যাচ্ছিল।

শোভার মা সেদিকে পা বাড়াতেই দেবানন্দ বলে, রও, রও। গাড়ীটারে ছাইড়া দিয়া আসি। বেশী দেরী হইলে ব্যাটা তিনগুণ ভাড়া আদায় করব।

রাস্তার শুধু একদিকে দু'হাত চওড়া ফুটপাত, তার গা ঘেঁষে

উপরে মাথা তুলেছে শীর্ণ রুগ্ন অজানা গাছটা।

ওই গাছের তলে ফুটপাতে জিনিষপত্র নামিয়ে সকলকে বসিয়ে গাড়ীর ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে দেবানন্দ আর শোভার মা আবার গলিতে ঢোকে।

খোলার বাড়ী খোলার ঘর হলেই নোংরা হয় না। খোলার ঘরের গরীব বাসিন্দারাও ঝাঁট দিয়ে লেপে পুঁছে ঘর দুয়ার সাফ রাখতে জানে—এরকম সাফ রাখাটা প্রায় শুচিবাইএর পর্য্যায়ে উঠে যায়। কিন্তু খোলার ঘরের সামান্য আশ্রয়েও এমন গিজগিজে ভিড় জমেছে মানুষের যে সাফ্ সুরুৎ রাখার চেষ্টা অসম্ভব হয়ে গেছে।

মানুষ জাতীয় জীবের খাটালে পরিণত হয়েছে বাড়ীগুলি।

দুর্গন্ধে অন্নপ্রাশনের অন্ন উঠে আসবে, আজও যাদের অন্নপ্রাশন হয়।

দু'জনের কোনরকমে থাকবার মত আঁধারে একটা সেঁতসেঁতে ঘর।

সেই ঘরে ঠাঁই জুটেছে ঘনশ্যামের পরিবারের ছোট বড় মোট আটজন মানুষের। এককোণে ঘনশ্যাম পড়েছিল চাদর মুড়ি দিয়ে। ঘনশ্যাম অথবা তার কঙ্কাল চেনাই মুস্কিল।

শোভার মাকে দেখে ঘনশ্যাম কাতরাতে কাতরাতে বলে, বারণ করলাম, তবু আইলা? এখন সামলাও।

দু'জনকে বসতে দেওয়া হয় দু'টুকরো তক্তায়। বোঝা যায়, তক্তার টুকরো দুটো সংগ্রহ করে আনা—ছেলেমেয়েদের দ্বারা। কাছেই কোথাও কংক্রীটের গাঁথনি উঠছে বোধ হয়।

আমাগো যে জানান নাই?

জানাব ভাবছিলাম। তোমাগো কি অবস্থা কে জানে। তারপর চিঠি পাইলাম, বারণ কইরা লিখলাম আইসো না। এখন মজা বোঝ।

শোভার মা মফস্বলের তেজে ফোঁস করে ওঠে, মজা কিসের? এত বড় পৃথিবীতে মাথা গোঁজনের ঠাঁই পামু না? ঠাঁই আদায় কইরা নিমু।

চুরি চামারী

লোকেশ মাইনে পেল চার তারিখে। রাত্রে তার ঘরে চুরি হয়ে গেল।

সেদিনও আপিস থেকে বাড়ী ফিরতে লোকেশের রাত ন'টা বেজে গিয়েছে। কোথাও আড্ডা দিতে সিনেমা দেখতে বা নিজের জরুরী কাজ সারতে গিয়ে নয়, সোজা আপিস থেকে বাড়ী ফিরতেই দেরী।

ছোট বেসরকারী আপিস—যদিও আধা-সরকারীভাবে সরকারের সঙ্গে যোগ আছে! লোক খাটে কম—যত লোকের খাটা দরকার তার চেয়েও কম।

এমনিতেই দু'এক ঘণ্টা বেশী খাটিয়ে নেয় ওভারটাইম না দিয়েই, মাসকাবারে কদিন আটটা সাড়ে আটটা পর্য্যন্ত আপিসে থাকতে হয়। খুব সোজা কৌশল, বেতন দেবার সুনিশ্চিত আশ্বাস দিয়েও সময়মত বেতন না দিয়ে আটকে রেখে খাটিয়ে নেওয়া।

এবং এমনি তাদের প্রচণ্ড প্রয়োজন মাসকাবারী বেতনটার যে আশায় আশায় রাত আটটা ন'টা পর্য্যন্ত কাজ ক'রে যায়।

মাইনে অঘোর দেবে, না দিয়ে উপায় নেই। আজ দিয়েও তো দিতে পারে?

অঘোর বলে, বসে থাকবেন না, বসে থাকবেন না। মাইনে পান খেটে খান—এ ভাবটা ভুলতে চেষ্টা করুন। ওরকম ভাববে কারখানার কুলিরা। মনে রাখবেন, বড় মন্দার বাজার। আপিস টিকে থাকলে তবেই আপনারা টিকে রইলেন, আপিসের উন্নতি হলে তবেই

আপনাদের উন্নতি।

তারা গুজগাজ ফোঁস ফাঁস করে। চাপা গলায় কেউ গর্জ্জে ওঠে, ছুস্তেরি তোর—

ক্ষোভ বুকে নিয়ে তবু কাজ করে যায়। কৌশলটা খাটছে না দেখলে অঘোর হয় তো চটে গিয়ে আরও বেতন গোণা একদিন পিছিয়ে দেবে শোধ নিতে।

কদাচিৎ পয়লা দোশরা তারিখেও বেতন মিটিয়ে দেয়। যে তারিখেই মাইনে পাক তারা সই করে পয়লা তারিখে পেয়েছে বলে।

উদ্বেগ চেপে রেখে ছবি প্রশ্ন করে, পেয়েছো আজ?

—পেয়েছি।

নোট কটা ছবির হাতে দিয়ে সে জামা কাপড় ছাড়তে থাকে।

মুখ হাত ধোয়া হতে না হতে ঘরের বাইরে বাড়িওলা সুরেনের গলা শোনা যায়—আছেন নাকি লোকেশবাবু?

লোকেশ ঘরের ভেতর থেকেই বলে, আছি মশায়, আছি। এত অস্থির হন কেন? সারাদিন খেটেখুটে এলাম, সকালে দিলে হত না?

—দেয়ারটা দিলেই চুকে যায়।

ছবি বলে, দিয়ে দাও চুকে যাক।

সুরেনকে ঘরখানার ভাড়া দিয়ে রসিদ নিয়ে খেতে বসে ক্ষুব্ধ লোকেশ বলে, কই আমরা তো পাওনা টাকা এভাবে আদায় করতে পারি না? প্রত্যেক মাসে মাইনে দিতে টাল বাহনা করবে, বেশী বেশী খাটিয়ে নেবে।

—খাটেন কেন? জোর করে বলতে পারেন না পয়লা তারিখে মাইনে চাই, বেশীক্ষণ খাটালে পয়সা চাই?

রুটি চিবোতে চিবোতে লোকেশ একটু ঝাঁঝালো হাসি হেসে

বলে, আপনি কি বুঝবেন বলুন? কম লোক, ইউনিয়ন ফিউনিয়ন নেই, যে ভেড়িবেড়ি করবে তাকে দেবে খেদিয়ে। আমরা কি বলাবলি করি না ভেবেছেন যে এসব অন্যায় আর সইব না? কিন্তু ওই বলাবলিই সার হয়। একজনকে এগিয়ে হাল ধরতে হবে তো? যে এগোবে সঙ্গে সঙ্গে তাকে বরখাস্ত করবে। ব্যাটা এক নম্বর চামার।

ছবি গোমড়া মুখে বলে, সত্যি। যা-দিনকাল, এর মধ্যে চাকরি-বাকরি চলে গেলে—

সে যেন শিউরে ওঠে।

রাত্রে দুজনেই তারা খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোয়। কাল দোকানের ধার দুধের দাম এসব মিটিয়ে দেওয়া যাবে। রেশন আসবে, অনেকদিন পরে আধপো মাছ এনে স্বাদে গন্ধে ভাত খাবে। ছবির জন্য শাড়ী একখানা চোখ কান বুজে কিনে ফেলা হবে কিনা সেটাও ঠিক করে ফেলা যাবে।

ঘুমের মধ্যে রাত্রে চুরি হয়ে যায়।

তারা টেরও পায় না।

ভোরে অন্য লোকের ডাকাডাকিতে ঘুম ভেঙ্গে ছাখে এই ব্যাপার!

. পাড়াতেই দু'তিন ঘরে চুরি হয়ে গেছে কিছুদিনের মধ্যে, তাদের ঘরে চুরি হওয়াটা মোটেই আশ্চর্য্য ব্যাপার নয়। কিন্তু জানালার বাঁকানো শিক, খোলা দরজা আর তাদের যথাসর্ব্বস্বের শূণ্য স্থান দেখেও যেন তাদের বিশ্বাস হতে চায় না যে সত্যসত্যই তাদের ঘরে চুরি হয়ে গেছে।

কেবল দু'টি মানুষ বলেই সামান্য মাইনেতে তাদের একখানা ভাড়াটে ঘরে মুখ গুঁজে কোনরকমে চলে যায়, তাদের ঘরে চুরি! পাড়াতেই

তো কত পয়সাওলা লোক আছে, এ বাড়ীর দোতালাতেই বাস করে বাড়ীওলা সুরেন—ওদের বাদ দিয়ে তাদের ঘরে হানা দেবার জন্ত এত হাঙ্গামা করার তো কোন মানেই হয় না !

তারা পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়।

লোক জড়ো হয়েছে, জিজ্ঞাসা মন্তব্য আর এখন তাদের কি করা কর্ত্তব্য সম্পর্কে উপদেশ দেওয়া চলছে, নিঃশব্দে তলার কাঠ কেটে চোরেরা কি করে এত মোটা শিক বাঁকিয়ে দিল তাই নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ ও জল্পনা-কল্পনা চলছে—কিন্তু লোকেশ আর ছবির কাছে কিছুতেই যেন ঠিকমত গুরুতর হয়ে উঠতে পারছে না ব্যাপারটা।

সুরেন বলে, দেখলেন তো মশায় ? ভাগ্যে ভাড়াটা আদায় করে নিয়ে গেছলাম, নইলে ওই টাকাটাও গচ্ছা যেতো আপনার।

শুনে লোকেশের যেন হাসিই পায়।

যার একরকম সর্ব্বস্ব চুরি হয়ে গেছে, ভাড়ার ওই কটা টাকা বেঁচে গেছে বলে তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা !

এই কথাটা উল্লেখ করে ছবিও পরে বলেছিল, আমার কাণ-পাশা যে বাঁধা দিয়েছিলে সেটাও তাহলে আমাদের ভাগ্যি বলতে হবে !

ঘরে ছিল একটি ট্রাঙ্ক, একটি চামড়ার সুটকেশ একটি হাতবাক্স, তাকে সাজানো কিছু বাড়তি বাসন আর আলনায় সাজানো জামা কাপড়। এ-সব কিছুই চোরেরা রেখে যায় নি !

নিত্য ব্যবহারের অর্থাৎ গায়ের গহনা আর রান্না খাওয়ার বাসনগুলি আছে। আটগাছা চুড়ির মধ্যে চারগাছা আছে, হাতে, গলায় হারটা আছে আর কাণে দুল। অন্য ভাড়াটের সঙ্গে সিঁড়ির নীচেকার ছোট্ট ঘরটিতে তাদের রান্না হয়, ও ঘরে থাকায় মাজা বাসন কটা রয়ে গেছে।

আর সমস্ত কিছুই চোরে নিয়েছে। সোণা রূপার গয়না ও উপহার

দ্রব্য, বিয়েতে এবং অন্যভাবে পাওয়া সমস্ত দামী জামা কাপড়—সাধারণ ভাল জামাকাপড় কটা পর্য্যন্ত !

আলনাটা পর্য্যন্ত খালি করে নিয়ে গেছে ?

এটাই যেন সকালে তাদের পীড়ণ করে সব চেয়ে বেশী !

পরণের লুঙ্গি আর একটা ছেঁড়া পাঞ্জাবী ছাড়া কিছুই নেই লোকেশের যে পরে আপিস যাবে !

লুঙ্গি আর ছেঁড়া পাঞ্জাবীটা পরে বেরিয়ে রাস্তায় যে জামাকাপড় কিনে নেবে তারও উপায় নেই, সারা ঘর হাঁতড়ে বেড়ালে দু'টো তামার পয়সা মিলবে কিনা সন্দেহ !

পয়সাকড়ি সব ওই হাত বাক্সটায় থাকত।

তারপর আছে পেটের ব্যাপার। রেশন আনলে, বাজার ক'রলে তবে খাওয়া জুটবে !

ছবির মুখে সত্যই এক ঝলক হাসি ফোটে। চোরেরা যেন তাদের জন্য একটা ভারি মজার অবস্থার সৃষ্টি করে গেছে।

—খাওয়া তো পরের কথা। এক দানা চিনি নেই যে তোমায় এককাপ চা করে দেব !

এতক্ষণ বড়ই চিন্তাক্লিষ্ট দেখাচ্ছিল লোকেশের মুখ, ছবির কথা বলার ভঙ্গিতে তার মুখেও হাসি ফোটে।

—কটা টাকা ধারের চেষ্টা দেখি। তারপর যা হয় হবে।

ছবির মুখের ভাব শক্ত হয়ে যায়।

—কার কাছে ধার চাইবে ? সেদিন যারা দশটা টাকা দিল না, কাণপাশা দুটো বাঁধা দিতে হল, আবার তাদের কাছে হাত পাততে যাবে ?

লোকেশ বলে, তা নয়। তখন মাসের শেষ, কারো হাতে সামান্য

টাকাও ছিল না। নইলে কি রমেশবাবু, তিলকবাবু ক'দিনের জন্যে দশটা টাকা দিত না? এমন বিপদ ঘটল, আজ যার কাছে চাইব সে-ই দেবে।

ছবি ধীরে ধীরে মাথা নাড়ে।

—ক'দিনের জন্য তো ধার নেবে, কদিন বাদে শোধ দেবে কোত্থেকে? সারামাস চালাবে কি দিয়ে?

লোকেশ গোমড়া মুখে বলে, সে যাহোক একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। উপায় কি?

—থাক্, তোমার আর আবোল-তাবোল ব্যবস্থা করে কাজ নেই! আমি ব্যবস্থা করছি—

বেশ খানিকটা মরিয়া বেপরোয়া মনে হয় ছবিকে। চোরেরা যেন ঘরখালি করে নিয়ে যাবার সঙ্গে তার মনের ভয় ভাবনাগুলিও চুরি করে নিয়ে গেছে।

—আজ আপিস না গেলে হয় না?

—মাইনে পেয়েই কামাই করাটা···

সমস্ত সমস্যা যেন মীমাংসা করে ফেলেছে এমনি ভাবে ছবি বলে, তা হলে এক কাজ কর।

বেলা হয়ে গেছে, রেশন এনে সাড়ে আটটায় খেয়ে বেরোতে পারবে না। দোকানে চা খেয়ে ওই বুড়ীর কাছ থেকে আধসের চাল আর দোকানে ডিম টিম যা পার এনে দাও—

এবার লোকেশ চটে যায়।

—চা খেতে, চাল ডিম আনতে পয়সা লাগবে না?

—পয়সা আমি দিচ্ছি!

বিয়ের কম দামী খাটের বিছানার তলায় ডান হাতটা প্রায় সমস্তখানি

ঢুকিয়ে দিয়ে হাতড়ে হাতড়ে ছবি বার করে আনে আস্ত একটা পাঁচ টাকার নোট!

বলে, ছ'সাত মাস আগে পাঁচ টাকা হিসেবে মেলেনি মনে আছে? হারিয়ে যায় নি, আমি চুরি করেছিলাম।

তারপর একটু উদ্বেগের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করে, চলবে তো? দুমড়ে মুচড়ে গেছে।

লোকেশ বলে, চলবে। একশোবার চলবে। তোমার জন্য চা আনব না?

—আমি মনোদির সাথে খাব'খন। এমন বিপদে পড়েও টাকা চাল ডাল ধার চাইছি না—এতখানি দয়ার বদলে এক কাপ চা না খাওয়ালে চলবে কেন।

লোকেশ তবু ইতস্তঃ করে।

ছবি তাগিদ নিয়ে বলে, দাঁড়িয়ে রইলে যে? বেলা বাড়ছে না?

—সব তো বুঝলাম। আমি আপিস যাব কি প'রে?

—সে ব্যবস্থা করছি। শুধু চা খাব না, মনোদি'র কাছে রবীন-বাবুর একখানা ধুতি ধার করব। পরশু তরশু লণ্ড্রীতে আর্জেন্ট ধুইয়ে ফেরত দিলেই চলবে।

লোকেশ তবু ইতস্ততঃ করে। —সে তো বুঝলাম। কিন্তু তারপর কি করব?

—ওর জবাব সেই এক কথা। কি আবার করবে, আপিস যাবার সময় নিয়ে যাবে।

লোকেশদের আপিসে সেদিন কাজে বড়ই ব্যাঘাত ঘটে। কাজ আরম্ভই হয় ঘণ্টাখানেক দেরীতে।

সবাই এসে পৌঁছে গেলে লোকেশ সকলকে বলে, টুল ফুল নিয়ে সবাই জড়ো হয়ে বসুন দিকি একসাথে। ভীষণ জরুরী কথা আছে।

তার মুখ দেখে আর কথা শুনে সবাই একটু হক চকিয়ে যায় বটে কিন্তু তাকে ঘিরে বসে সকলেই।

কোনরকম ভূমিকা না করে লোকেশ জোরের সঙ্গে ঝাঁজের সঙ্গে বলে, আমরা কি কুকুর বিড়াল, যত ইচ্ছা খাটিয়ে নেবে, সকাল ন'টায় সুরু করিয়ে রাত ন'টায় ছুটি দেবে? সময়মত মাইনে দেবে না?

একজন বলতে যায়, তোমার বাড়ীতে নাকি চুরি হয়েছে শুনলাম?

লোকেশ বলে, ঘর খালি করে সব নিয়ে গেছে।

সে গল্প পরে বলছি। এখন কাজের কথা শুনুন। আমরা চুপচাপ মেনে নিই বলে আরও পেয়ে বসেছে! আজ আমরা সাফ জানিয়ে দেব যে আমরা আপিস আইনের বাঁধা টাইমের বেশী খাটব না, খাটালে ওভার-টাইম দিতে হবে। ঠিক তারিখে মাইনে দিতে হবে আমাদের।

সকলে নির্ব্বাক হয়ে থাকে।

লোকেশ শান্তভাবেই বলে, ভয় পাবেন না। যা বলার আমিই বলব অঘোরবাবুকে, আমিই সকলের হয়ে ঝগড়া করব। আপনারা শুধু আমার পিছনে থাকবেন। যদি ক্ষতি করে আমার করবে, আপনাদের কিছু করবে না।

তার বাড়ীর চুরির ব্যাপারটা জানতে চেয়েছিল প্রৌঢ় বয়সী যতীন। সে সঙ্গে সঙ্গে জোর দিয়ে বলে তোমার একলার ক্ষতি করবে মানে? আমরা তা মানব কেন?

একঘণ্টা আলোচনার পর যে যার যায়গায় গিয়ে বসে। কিন্তু কাজে কারও মন বসে না। অঘোর আরও দেরীতে আসবে, কিন্তু খবর

তার কানে পৌঁছুবে। নিশ্চয় ডেকে পাঠাবে লোকেশকে।

তারপর কি নাটক আরম্ভ হবে কে জানে ছা-পোষা চাকরী-সর্ব্বস্ব তাদের আপিস জীবনে ?

অঘোর যথাসময়ে আসে। নিজের ঘরে বসে। কাজ করার বদলে সকলে একঘণ্টা জটলা করেছে, খাস ও একমাত্র বেয়ারা বেচুর কাছে এ খবরও নিশ্চয় সে শোনে। কিন্তু সারাদিন কেটে যায়, লোকেশকে সে ডাকে না।

আপিসের মুষ্টিমেয় মানুষকটার বিদ্রোহের খবর যে সে পেয়েছে সেটা টের পাওয়া যায় একটিবারও তার আপিস ঘরে না আসায়। রোজ সে তিন চার বার টহল দিয়ে যায়।

ক্রমে ক্রমে সকলে এটাও টের পায় যে অঘোর প্রতীক্ষা করছে। তারা নিজে থেকে কি করে না দেখে সে কিছুই করবে না!

পাঁচটা বাজতেই সকলে কাজ বন্ধ করে উঠে দাঁড়ায়। লোকেশ বেচুকে ডেকে বলে, বল গে' যাও, আমরা যাচ্ছি!

মিনিট পাঁচেক পরে অঘোর নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে শান্ত কিন্তু গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করে, কি ব্যাপার ?

অবুঝ ছেলেরা দুষ্টামি করে বায়না ধরেছে। সে পিতার মত শুনতে চায় তাদের নালিশ! শুনে নিশ্চয় স্নেহময় কিন্তু তাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী অভিভাবক পিতার মতই বিচার করবে।

লোকেশও শান্ত গম্ভীর ভাবে তাদের নালিশ জানায়, তারা অতঃপর কি করবে স্থির করেছে তাও জানায়।

অঘোর উদাস উদারভাবে বলে, বেশ তো। তোমরা চাকরী করার সরকারী আইন মত চাকরী করতে চাইলে আমি কি না বলতে পারি ? আমি কি আইন ভেঙ্গে গায়ের জোরে তোমাদের বেশী

খাটিয়েছি? ওসব আইন-টাইনের কথা খেয়ালও ছিলনা। আমার আমরা মিলেমিশে কাজ করছি, মানিয়ে চলছি, ব্যস।

লোকেশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে বলে, তোমরা যে ঘরোয়া ব্যবস্থাটা পছন্দ করছ না আমাকে জানালেই হত। হঠাৎ এরকম গণ্ডগোল করার কোন মানে হয়?

নিজের আপিসের উপরেই যেন বিতৃষ্ণা এসেছে এমনিভাবে নাক মুখ সিঁটকোতে সিঁটকোতে অঘোর সকলের আগে বেরিয়ে গিয়ে গাড়ীতে ওঠে।

একটা মস্ত যুদ্ধে যেন জয়লাভ করেছে, প্রকাণ্ড অনিয়ম থেকে রেহাই পেয়েছে, এমনি ভাবেই সকলে কলরব করে, সমবয়সী দু'একজন পিঠ চাপড়ে দেয় লোকেশের।

প্রৌঢ় যতীন বলে, আজকেই শেষ হয়ে গেল ভাবছ নাকি তোমরা? আমরা গুটিগুটি মেরে পিছনে দাঁড়িয়ে রইলাম, লোকেশ বেচারা এগিয়ে গিয়ে ঝগড়া করল—ব্যস্, অমনি সব ঠিক হয়ে গেল। বেকায়দায় পড়ে মেনে নিয়েছে তাই। শোধ না তুলে ছাড়বে ভেবেছ?

সবাই চিন্তিত হয়ে বাড়ী ফেরে।

গত রাত্রে চুরি হয়ে গেছে—গয়নাগাঁটি মালপত্র। আজ ভোর রাত্রেও যে চোর আসবে কে তা জানত!

ছবির আর সব গেছে। অল্পদামী বিয়ের খাটে লোকেশের পাশে শুয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমানোর অধিকারটা বজায় ছিল।

শেষ রাত্রে প্রকাশ্যভাবে ভ্যান চালিয়ে চোর এসে তার বাহু বন্ধন থেকে চুরি করে নিয়ে যায় লোকেশকে। আটক আইনের জোরে।

দায়িক

অলক্ষুণে সন্তান ?

নইলে প্রায় এগারটি মাস মায়ের পেট দখল করে থেকে এমন অসময়ে ভূমিষ্ঠ হয়, অসময়ের এই বাদলা আর হাড়-কাঁপানি শীত সুরু হবার পর ?

মেয়েটাকে মারবার জন্যই কি দেবতাদের ইঙ্গিতে প্রকৃতির এই নিয়মভাঙ্গা খাপছাড়া আচরণ ?

কে জানে !

একটা ছেলেকে মারবার জন্য দেবতারা ব্যস্ত হয়ে প্রাকৃতিক বিপর্যায় ঘটাবে, এটা ভাবতেও আবার মনটা খুত খুত করে গোবিন্দের।

কেন তবে তার প্রথম সন্তানের নিশ্চিত মরণ এভাবে ঘনিয়ে আসবে ?

ক্রমে ক্রমে শীতের এখন বিদায় নেবার পালা। এলোমেলো উল্টো পাল্টা বাতাস বইবে কখনো উত্তর কখনো দক্ষিণ থেকে, রাতে কাঁথা-কাপড় দরকার হলেও দিনের বেলায় ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব খালি-গা জুড়িয়ে দেবে। তার বদলে বলা নেই কওয়া নেই সুরু হয়েছে টিপি টিপি বৃষ্টির সঙ্গে কন্‌কনে উত্তুরে হাওয়া !

কী দাপট শীতের।

হোগলার একরত্তি আঁতুড় ঘর। গোয়ালের পাশে ছিটাঙ্গের গা ঘেঁষে তোলা। ভিতের লেপা পোঁছার বালাই নেই, মানুষের জন্মলাভের মত নোংরা অস্থায়ী ব্যাপারটার জন্য অত হাঙ্গামা কে করে ? মাটিটা

শুধু একটু চেঁছে দেওয়া হয়েছে কোদাল দিয়ে।

সস্তা পুরাণো হোগলার চালাটা তুলে ভিতরে দুটি খড় বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। খড়ের উপর বস্তা-কাটা পুরাণো ছেঁড়া একটা চট।

মোটে একটা মাসের ব্যাপার। মাস কাটলেই আঁতুড় উঠবে, স্নান করে শুদ্ধ হয়ে ছেলে নিয়ে রেবতী ঘরে উঠতে পাবে। তখন ফেলে দেওয়া হবে হোগলার চালা।

চিরকালের এই রীতি।

তার বাপদাদারাও এমনি চালার ঘরে জন্মেছে, তার নিজের বেলাও অন্য কোন ব্যবস্থা হয় নি।

অনেক পুরুষ ধরে অনেকে যেমন জন্মেছে তেমনি অনেকে অবশ্য মরেও গেছে এই আঁতুড়ে।

তা তো মরবেই। জন্ম আর মৃত্যু নিয়ে সংসার—শুধু জন্ম নিয়ে তো নয়।

মেয়েটা বাঁচবে আশা করতে ভরসা হয় না। রেবতীও বাঁচবে কিনা সন্দেহ। বাদলা ধরার বা শীত কমার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। বেড়ার চারিদিকে মাটির আল তুলে দিয়ে গোবিন্দ ভিতরে জল গড়িয়ে যাওয়া ঠেকিয়েছে, কিন্তু হোগলার ফাঁক দিয়ে জলের ছাঁট যাওয়া বন্ধ করা যায় নি।

দাওয়ায় বসে গোবিন্দ আকাশ-পাতাল ভাবে, রেবতীর ক্ষীণ কণ্ঠ কাণে এলেও কিছুক্ষণ সাড়া দেয় না। তারপর ধীরে ধীরে উঠে মান পাতাটা তুলে মাথায় দিয়ে আঁতুড়ের কাছে যায়। আঁতুড়ের হোগলার উপরে চাপাবার জন্যই সে কয়েকটা মানপাতা কেটে এনেছিল।

রেবতী শীতে কাঁপছিল কিন্তু কথা বলতে গিয়ে গলা তার কেঁপে

যায়। ভয়েই বলে, সেঁক তো দিলাম, আওয়াজ দিচ্ছে না যে? আরেকটু আগুন করে দাও।

—দিচ্ছি।

সে একদৃষ্টে খানিকক্ষণ দুদিনের বাচ্চাটার দিকে চেয়ে থাকে। শরীরটা কাঁথায় ঢাকা, মুখটা শুধু দেখা যায়। শ্যামবর্ণ শিশুর মুখের চামড়াটা যেন খানিকটা নীল হয়ে কালচে মেরে গেছে মনে হয়।

রেবতী ক্ষীণ গলায় আবার বলে, ছাঁট লেগে ভিজে যাচ্ছি। হাড়ের তেজ নেই? ভেতর থেকে কাঁপছে। হাতপাগুলো অবশ লাগছে।

গোবিন্দ নীরবে শোনে।

দাওয়ায় ফিরে যাবার উপক্রম করতেই রসুই ঘর থেকে মা ডেকে বলে, আবার ভেতরে ঢুকলি কেন রে? যা, ডুব দিয়ে আয় পুকুর থেকে—

—তুমি একটু আগুন করে দাও দিকি।

বলে গোবিন্দ গট গট করে দাওয়ায় উঠতেই রসুই ঘরে মা আর মাসী পীসি চেঁচামেচি জুড়ে দেয়, ঘর থেকে গগন বেরিয়ে এসে ঝাঁঝের সঙ্গে বলে, আহা-হাহা, এত বড় ধেড়ে মানুষটা, তোর কি বুদ্ধি বিবেচনা—আঁতুড় ঘেঁটে সেই কাপড়ে ঘরে ঢুকছিস?

—ঘরে ঢুকছি না।

গোবিন্দ ব্যাজার হয়ে দাওয়ায় উবু হয়ে বসে পড়ে।

গগন বলে, দাওয়ায় উঠলি কি বলে?

গোবিন্দ কথা কয় না। বাড়ীর মানুষেরা অনেকক্ষণ গজর গজর করে, বার বার গোবিন্দকে অন্ততঃ ঘাটে গিয়ে কাপড়টা কেচে আসবার জন্য বলা হয়—কখনো মিনতি করে, কখনো রাগ দেখিয়ে।

শেষে গোবিন্দ বলে, আমার আর কাপড় নেই।

গগন বলে, আমার কাপড়টা দিচ্ছি, তুই ঘাটে যা দিকি। ঘরদোর অশুচি করলে তোর ছেলে বৌ-য়েরি অকল্যাণ আগে হবে, এই সিধে কথাটা বুঝিস নে তুই ?

গোবিন্দ অগত্যা ঘাটে গিয়ে ডুব দিয়ে আসে; বাড়ীর মানুষের চাপ বা পাপের ভয়েই ঠিক নয়। তার নিজের মনটাও খুঁত খুঁত করছিল! সে ঘাটে যেতেই অন্নদা তাড়াতাড়ি সমস্ত দাওয়াটা গোবর জলে লেপে দেয়।

ডোবাপুকুরে ডুব দিয়ে এসে রেবতীর একটা পুরাণো ছেঁড়া শাড়ী দুভাজ করে কোমরে জড়িয়ে ভিজে কাপড়টা দাওয়ায় টান করে মেলে দিয়ে গোবিন্দ দাওয়াতেই উবু হয়ে বসে আকাশ পাতাল ভাবে।

গগন পরণের কাপড়খানা ছেড়ে দিতে চাইলেও সে কাপড় পরা যায় না। গগনকে তাহলে গামছা পরতে হয়। গায়ে একটা কুর্তা আছে বটে কিন্তু এই ঠাণ্ডায় আধভেজা গামছা পরে থাকলে বুড়ো গগনকে নির্ঘাৎ বিছানা নিতে হবে।

এবং সম্ভবতঃ বিছানা থেকেই তাকে চালান করতে হবে শ্মশানে।

ছেঁড়া শাড়ীটা দিয়ে বাচ্চাটাকে আরেকটু ঢেকে দেবার কথা ভাবছিল। এখন বাধ্য হয়ে নিজের কোমরেই সেটা জড়াতে হয়।

বাড়ীর চারিদিকে এককালে বেড়া ছিল, বছর খানেক হয় ভেঙ্গে পড়েছে। গগনের মেটে পথ থেকে ঘরের দাওয়ায় বসা মানুষেরও বুক পর্য্যন্ত নজরে পড়ে।

জলে কাদায় পিছল পথে জুতো হাতে নিয়ে আঙ্গুল টিপে টিপে চলতে চলতে নরেন দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করে, খবর কি গোবিন্দ ?

গোবিন্দ উঠে গিয়ে বলে, আর-খবর, খবর আমার চোদ্দপুরুষের পিণ্ডি।

অল্পক্ষণের জন্য বৃষ্টিটা একটু থেমেছিল, ভাঙা ছাতিটা ছিল নরেনের বগলে। তবে বৃষ্টি একেবারে বন্ধ হবে সে আশা নেই। আকাশ দেখেই টের পাওয়া যায় খানিক বাদে আবার নামবে।

হোগলার চালাটার দিকে চেয়ে নরেন জিজ্ঞাসা করে, কেমন আছে ?

—এখনো টিকে আছে। বাচ্চাটা বোধ হয় ওবেলাই যাবে, ওর মা-টার হয়তো বা আরও দু'চার দিন লাগতে পারে।

নরেন গম্ভীর হয়ে বলে, তবু হাতপা গুটিয়ে দাওয়ায় বসে আছ ? মানুষ খুন করলে পাপ হয় জানো না ? ঘরে নিলে যদি পাপ হয়, সেটা অনেক ছোট পাপ।

গোবিন্দ ঝাঁঝের সঙ্গে বলে, হাঃ! পাপের কথা ভাবছে কে ? মন নয় একটু খুঁত খুঁত করবে, সাতপুরুষের নিয়ম ভাঙা হল। সে জন্য আটকে আছে নাকি! ঘরে নিলে বাড়ীর সবাই হাউমাউ করে উঠবে না ?

করুক হাউমাউ। তোমার ছেলে বৌ তো বাঁচবে।

গোবিন্দ করুণভাবে একটু হাসবার চেষ্টা করে। রোজ আপিস যাচ্ছ, মাসকাবারে বেতন গুনছ। বেকারের দশা কি বুঝবে ? ঘর-বাড়ী বুড়ো বাপের, বাপের ঘাড়ে খাই। সোজা বলবে, ম্লেচ্ছ অনাচারী পাষণ্ড, বেরো আমার বাড়ী থেকে, দূর হয়ে যা।

নরেন সঙ্গে সঙ্গে বলে, বলুক না ? পরে নয় বেরিয়েই যাবে, আজ তো ওদের বাঁচাও! গায়ের জোরে তো ওরা পারবে না তোমার সঙ্গে ? গায়ের জোরে ঘরে নিয়ে যাও। কয়লা কাঠ না থাকে, ঘরের খুঁটি ভেঙে আগুন করে সেঁক দাও। এটুকু যদি না কর, আমি তোমাকে খুনী বলব। বলে বেড়াব, তুমিই নিজের বৌ ছেলেকে খুন করেছ!

নরেন আর দাঁড়ায় না। আটটার গাড়ী ধরতে না পারলে অপিসে লেট হয়ে যাবে। সেটা কম বিপদের কথা নয়, তবু আরও কিছুক্ষণ দাঁড়ালে যদি কিছু লাভ থাকত তবে না হয় আজ লেটই করত। গোবিন্দকেও তো সে জানে। বাড়ীর লোক হাউমাউ করবে এটা বাজে অজুহাত, আসল বাধা গোবিন্দের নিজের মনে।

নিজের মন থেকেই সে সায় পাচ্ছে না। নইলে বাড়ীর লোকের অসন্তোষের খাতিরে কেউ চোখের সামনে বৌ ছেলেকে মরে যেতে দিতে পারে—ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে একটু আড়াল আর আগুনের তাপের ব্যবস্থা করলেই দুজনে বেঁচে যাবে যখন জানা আছে ?

এদিকে গোবিন্দ গালে হাত দিয়ে বসে নিজের মনে বলে, এতই যেন সহজ !

মুখে বলা আর কাজে করা।

ওদের ঘরে তুলবার চেষ্টা করলেই যে কি কাণ্ড শুরু হবে নরেন তার কি জানবে ? সে তার গায়ের জোরটাই দেখছে, গায়ের জোরটাই যেন সব।

গায়ের জোরে যেন তাকে ঠেকাবার চেষ্টা করা হবে আর জোরে না পারলে হার মেনে শুধু চেঁচামেচি করে তাকে দুর হয়ে যেতে বলেই সবাই ক্ষান্ত থাকবে।

হঠাৎ সত্যিকারের উন্মাদ হয়ে যাবে বুড়ো বাপটা, বুক চাপড়ে চেঁচিয়ে মাথার চুল ছিঁড়ে জলে কাদায় গড়াগড়ি দিয়ে তো বা মেরেই ফেলবে নিজেকে।

মা ঘরের কোণার সিঁদুর মাখানো পটটার সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়ে একটানা আর্তনাদ করে যাবে এবং খুব সম্ভব এক ফাঁকে এই শীত-বাদলার মধ্যে এক কাপড়ে বেরিয়ে চলে যাবে যেদিকে দু'চোখ যায়।

অন্তেরা কি করবে সে হিসাব নয় নাই ধরল। মা বাপের কথাটা না ভাবলে চলে কি করে ?

গোবিন্দ অসহায়ের মত চেয়ে থাকে। মনে হয়, সে যেন যাঁতাকলে পড়েছে, যে যাঁতাকলে মানুষের ভেতরটা পিষে দুমড়ে মুচড়ে যায়। নরেন কি করে বুঝবে চোখের সামনে ছেলে বৌকে অত্যাচারের হাতে মরতে দিয়ে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকতে হলে মুহূর্তগুলি কেমন করাতের দাঁতের মত হয়ে ওঠে, সময় কি ভাবে প্রাণটাকে ধীরে ধীরে চিরে চিরে দিয়ে যেতে থাকে।

কাঠের উনানের কিছু জ্বলন্ত কয়লা একটা সরায় নিয়ে গামছা পরে অন্নদা আঁতুড়ে যায়—বেরিয়ে ঘাটে গিয়ে ডুব দিয়ে এসে রান্না ঘরে ঢুকবে।

একটু পরেই অন্নদা বেরিয়ে আসে, গোবিন্দের ছোট পিসীকে ডেকে আঁতুড়ে পাঠিয়ে দেয়।

ঘাটে যাবার বদলে ছেলের সামনে এসে দাঁড়িয়ে মৃদুস্বরে বলে, ভাবিস কেন ? ভগবানকে ডাক।

—ভগবান তো সবই করছেন।

—ও কথা বলতে নেই বাবা!

একটু ইতস্ততঃ করে অন্নদা আবার বলে, টিন যোগাড় হয় না ?

—কোথা পাব ?

একটু দাঁড়িয়ে নিজের মনে কি যেন ভাবে অন্নদা, তারপর ঘাটে গিয়ে স্নান করে গামছা কেচে শুদ্ধ হয়ে না এসেই ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢোকে!

গোবিন্দ অবাক হয়ে চেয়ে থাকে।

তার সঙ্গে কথা কইতে কইতে মা কি ভুলে গেছে তার সদ্য সদ্য আঁতুড় থেকে বেরিয়ে আসার কথা ?

খানিক আগে তাকে আঁতুড় থেকে বেরিয়ে শুধু দাওয়ায় উঠতে দেখে চেঁচামেচি জুড়েছিল, ঘাটে গিয়ে ডুব দিয়ে আসতে বাধ্য করেছিল, আর নিজের বেলা সব ভুলে গিয়ে সোজা ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকল !

কি আজব ব্যাপার।

তারপর ভিতরে গগনের সঙ্গে তাকে নীচু গলায় কথা বলতে শুনে গোবিন্দের প্রাণটা ছলাৎ করে ওঠে।

শেষ হয়ে গেছে ? আঁতুড়ের মৃত্যুর ধাক্কায় মার খেয়াল নেই ওখান থেকে বেরিয়ে স্নান না করে ঘরে ঢোকা চলে না ?

বাচ্চাটা ? না, বৌটা ?

উঠে গিয়ে দেখে আসবে সে শক্তি যেন গোবিন্দ পায় না। বসে বসে সে একটা কথাই বার বার মনে এনে সে আঁকড়ে থাকার চেষ্টা করে যে চীৎকার করে চেঁচিয়ে কেঁদে না উঠে মরণকে এমন চুপচাপ বরণ করার মানুষ তো তার মা নয় !

বাচ্চাটা শেষ হয়ে গিয়ে থাকলেও এতক্ষণে মা'র কান্নার আওয়াজে চারিপাশের অনেক বাড়ীতেই জানাজানি হয়ে যেত, এ বাড়ীতে মৃত্যুর পদার্পণ ঘটেছে।

খানিক পরে গগন আর অন্নদা দাওয়ায় বেরিয়ে আসে।

গগন জিজ্ঞাসা করে, একটা কিছু ব্যবস্থার কথা ভেবে পাচ্ছ না ?

গোবিন্দ বলে, কি আর ব্যবস্থা করব ?

গগন আপশোষ করে বলে, হাতে একটা পয়সা নেই যে কিছু করি। পাঁচজনের কাছে ধার জমে আছে, আবার গিয়ে চাইলে কেউ দেবে না। কপাল রে !

অন্নদা একট: দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে।

গোবিন্দ নীরবে দু'জনের ভাব লক্ষ্য করে।

তার মনে হয় শুধু এই কথাগুলি বলার জন্য ঘরের মধ্যে পরামর্শ করে তারা যেন দাওয়ায় আসে নি, এটা নিছক ভূমিকা, তাদের আরও কিছু বলার আছে এবং সেটাই আসল বক্তব্য।

গগন বলতে যায়, আমি ভাবছিলাম কি—

অন্নদা তাড়াতাড়ি যোগ দেয়, মাথা ঠাণ্ডা করে শুনিস বাবা, কথাটা, একটু বিবেচনা করে দেখিস্। এমন ঝপ্ করে ক্ষেপে যাস, তোকে কিছু বল্‌তেই ভয় হয়।

গোবিন্দ ধীরে বলে, কি বলছ শুনি না?

গগন বলে, বৌমাকে ওখান থেকে সরাতে হয়, বাচ্চাটা তেমন নড়াচড়া করছে না।

অন্নদা বলে, এমনি কড়া শীত হলে ভাবনা ছিল না, বাদলটা নামায় হয়েছে মুস্কিল।

গোবিন্দ নীরবে প্রতীক্ষা করে।

সে টের পায় তার কাছে হঠাৎ কথাটা পাড়তে গগনও সাহস পাচ্ছে না, ইতস্ততঃ করছে। গোবিন্দ আশ্চর্য্য হয়ে ভাবে যে ঘরের মধ্যে এতটুকু সময় একটু পরামর্শ করেই কি এমন গুরুত্বপূর্ণ কথা তারা ঠিক করে ফেলেছে যা তাকে বলতে গিয়ে এতখানি ভূমিকা দরকার হয়, এতবার ঠেকে গিয়ে গগনকে ঢোঁক গিলতে হয়?

দু'জনে চুপ করে আছে দেখে গোবিন্দ শান্তভাবে বলে, কি বলছিলে বল না?

কথাটা শেষ পর্য্যন্ত বলে ফেলে অন্নদাই।

বলে, আমরা বৌমাদের ঘরে আনব ঠিক করেছি, তুই কিছু বলতে

পারবি না।

গগন তাড়াতাড়ি বলে, ওখান থেকে না সরালে বাঁচবে না।

গোবিন্দ হতবাক হয়ে থাকে।

তার বৌ ও বাচ্চাটাকে ঘরে আনার প্রস্তাবে সে সম্মতি দিতে পারছে না ধরে নিয়েই যেন গগন তাকে বুঝিয়ে বলে, এমন কিছু দোষ হবে না। একটা কোণা সাফ করে পুরণো তক্তপোশটা পেতে দিলেই হবে, পরে নয় ফেলেই দেব ওটা। আঁতুড় উঠলে ঠাকুর মশায়কে ডেকে ঘরটা শুদ্ধ করে নেয়া, একটা প্রাচিত্তির করা—ফুরিয়ে গেল। এতে আপত্তি করার কি আছে?

অন্নদা হঠাৎ যেন ছেলের ওপর বিষম চটে যায়। চেঁচিয়ে জোর দিয়ে বলে, না তোর মানা শুনবো না আমরা, ছেলের ঘরের প্রথম নাতি—

তার গলার কথা আটকে যায়।

গোবিন্দের মনে হয় ভেতর থেকে যেন প্রচণ্ড একটা হাসির বেগই ঠেলে উঠেছে, কিন্তু হাসি তার আসে না।

কোন রকমে সে উচ্চারণ করে, আনো ঘরে।

অন্নদা তারই অনুমতির জন্যই যেন কোন রকমে ধৈর্য্য ধরে ছিল, আঁতুড়ে ছুটে যায়। আগুনের মালসা হাতে নিয়ে একটা ন্যাকড়ার পুটলি বুকে করে এসে ঘরে ঢোকে।

গোবিন্দের চমক ভাঙ্গে অন্নদার ডাকেই।

—পাঁজাকোলা করে তুই বৌমাকে তুলে নিয়ে আয় বাবা। উঠে আসতে পারবে না।

মহাকর্কট বটীকা

ঘুষঘুষে জ্বর ছিল। খুক্ খুক্ কাসি।

তার ওপর গলা দিয়ে উঠল দু'ফোঁটা রক্ত।

তাজা লাল রক্ত!

আরও কি লক্ষণ দরকার হয় ব্যাপার বুঝতে, এর পরেও কি মানুষ খানিকটা 'হয়তো' মেশানো আশাও করতে পারে যে জ্বর কাসি আর রক্ত ওঠাটা সেরকম ভয়ানক কিছু নয়, নাও হতে পারে?

এতটুকু রক্ত। একটু আঙুল কাটলে এর চেয়ে কত বেশী রক্ত পড়ে! হারাণ স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে মৃত্যুর এই সংক্ষিপ্ত লাল পরোয়ানার দিকে।

বলে, আর ভাবনা নেই। এবার সব ফিনিস্!

ছাইবর্ণ হয়ে গেছে লতার মুখ। শুধু হাত পা নয়, ভেতরটাও তার থরথর করে কাঁপছে। সেই সঙ্গে দুলছে ঘরবাড়ী, পৃথিবী। কিন্তু তবু আশা সে ছাড়বে না। মনে হচ্ছে দুঃখ দুর্দশা ভরা সমস্ত অতীত জীবনটা যেন গভীর কালো হতাশার রূপ নিয়ে অন্ধকার করে দিয়েছে ভবিষ্যৎ, তারও আর বাঁচার জন্য লড়াই করার মানে থাকল না।

—না না, হয় তো কিছুই নয়। ডাক্তার না দেখিয়ে কিছু বলা যায়? পরীক্ষা না করিয়ে?

—ডাক্তার অবশ্য দেখাবো। এক্স রে ফটোও তোলা হবে। কিন্তু সেটা প্রমাণের জন্য নয়। কতদূর এগিয়েছে রোগটা, কি অবস্থা,

বুঝবার জন্য।

মৃত্যু যেন এখনি ঘনিয়ে আসছে এমনি হতাশা হারাণের চোখে।

লতা একবার চোখ বোজে। জোর চাই, বুকে বল চাই। এভাবে কাঁপলে, সর্বাঙ্গ অবশ হয়ে এলে, চলবে কেন? সেও যদি হাল ছেড়ে দেয়, সর্বনাশ ঠেকাবার চেষ্টাও যে হবে না?

চোখ মেলে সে কথা বলে। নিজের কথাগুলি নিজের কানে তার লাগে অন্য কারও কথার মত।

—যদিই বা হয়ে থাকে, চিকিৎসা করলে সেরে যাবে। আজ কাল কত ভাল চিকিৎসা বেরিয়েছে, বেশীর ভাগ সেরে যায়। নন্দ বাবুর ছেলেটা সেরে ওঠে নি?

হারাণ আর কিছু বলে না।

এ রোগ সারিয়ে এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার আশা সে ছেড়ে দিয়েছে, কিন্তু লতাকে কাবু করে লাভ নেই।

বাড়ীওলা নন্দবাবুর ছেলে। মাছ, মাংস, দুধ, ঘি, সন্দেশ খেয়ে আর অজস্র বিশ্রামের সুযোগ ভোগ করেও তার এ রোগ হয়েছিল কেন কে জানে! বোধ হয় নানা বিকৃত খেয়ালে শরীরটাকে কাবু করেছিল বলে। মৃত্যুর পরোয়ানা পাওয়া মাত্র ভড়কে গিয়ে আত্ম সমর্পণ করেছিল নন্দবাবুর অজস্র পয়সা খরচ করা ওষুধ পথ্য আলো বাতাস বিশ্রামের চিকিৎসায়।

ছ'মাসে সে শুধু সেরেই ওঠেনি, দিব্যি নাদুসনুদুস চেহারা বাগিয়েছে। স্বাস্থ্য যেন পুষ্টি-রসে রসস্থ হয়ে উথলে পড়েছে তার সর্বাঙ্গে।

কিন্তু কম খেয়ে বেশী খেটে সে বাধিয়েছে রোগ—নিজে বাঁচার জন্য আর আপনজনকে বাঁচানোর জন্য শরীরকে পুষ্টি না দিয়ে ক্ষয়, একটানা ক্ষয় করে এসেছে শক্তি আর স্বাস্থ্য। কি দিয়ে এখন সে

লড়বে এ রোগের সঙ্গে ? সুস্থ দেহ নিয়ে যা ঠেকানো যায় নি, এসে চেপে ধরে কাবু করার পর অসুস্থ দেহ নিয়ে সেটাকে দূর করার বাড়তি ক্ষমতা সে কোথায় পাবে ?

আর হয় না। এবার শুধু দিন গোণা।

শচীনের সব জানা শোনা আছে। তাকে বলতে সে পরীক্ষার ব্যবস্থা করে দেয়। সেই সঙ্গে তাদের সাবধান করে দেয় যে বাড়ীর অন্য ভাড়াটেরা যেন কিছু জানতে না পায়।

বুক পরীক্ষার ফল জানা যায়। চিকিৎসার বিস্তারিত বিধানও পাওয়া যায়।

ডাক্তারের কাছ থেকে লতা নিজে সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নেয়। শুধু কি করতে হবে জেনে নেওয়া নয়, যতটা পারে বুঝেও নেয়, কিসে কি হয় আর কেন হয়, কোন ব্যবস্থার গুরুত্ব কতখানি।

না খাটলে যার পেট চলে না তার কি রাজসিক রোগ!

দামী ওষুধ চাই, দামী পথ্য চাই, সূর্যের আলো চাই, মুক্ত বায়ু চাই, আরামে বিশ্রাম চাই, আর চাই আনন্দ, আশ্বাস ও আত্মবিশ্বাস।

ঘিঞ্জি পাড়ায় গলির মধ্যে পুরনো বাড়ীর আধাঅন্ধকার সেঁতসেঁতে একখানা ঘর, দু'বেলা নিজেদের এবং আরও অনেকের উনানের ধোঁয়া ঘর ছেড়ে যেন যেতে চায় না। এই ঘরে যাদের বাস, দুটী বাচ্চার জন্য যাদের শুধু এক পোয়া দুধ বরাদ্দ, মাসের গোড়ার দিকে মোট দুটো চারটে দিন যারা মাছের স্বাদ পায়, অভাব ও দুর্ভাবনায় জর জর হয়ে যাদের মাস কাবার হয়, তাদের আজ এত সব বাড়তি ব্যবস্থা দরকার।

একটা অদ্ভুত হাসি মুখে ফুটিয়ে হারান বলে, বাদ দাও। এত ব্যবস্থাও হয়েছে, আমার রোগও সেরেছে। অনর্থক কতগুলি টাকা নষ্ট হবে।

খরচটা বাঁচবে, ওরাও ছোঁয়াচ থেকে বাঁচবে, সে নির্ঝঞ্ঝাটে লড়াই চালিয়ে যেতে পারবে রোগটার বিরুদ্ধে।

গয়না থেকে শুরু করে যা কিছু বেচা সম্ভব সব সে বেচে দেয়। আত্মীয়-স্বজন যার কাছে যতটুকু সাহায্য বা ঋণ পাওয়া সম্ভব আদায় করার জন্য উঠে পড়ে লেগে যায়।

কাঁদাকাটা করা থেকে হাতে পায়ে ধরা, একেবারে নাছোড়বাঁদীর মত এটে থেকে জীবন অতিষ্ঠ করে তোলা ইত্যাদি যতরকম উপায় আছে আত্মীয় বন্ধুর কাছে সাহায্য আদায়ের, তার কোনটাই সে বাদ দেয় না। মান-অপমানের বোধটা একেবারে ছাঁটাই করে সে যেন চারিদিকে আক্রমণ চালায়।

শচীন বলে দিয়েছিল, অন্য ভাড়াটেরা যেন হারানের অসুখ টের না পায়। কিন্তু সর্বস্ব পণ করে চিকিৎসা আরম্ভ করে দেবার পরেও কি আর এই মহারোগ গোপন করা যায়!

লতা টের পায়, বাড়ীর অন্য বাসিন্দারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে! এক বাড়ীতে থেকেও যতদুর সম্ভব দুরত্ব বজায় রেখে চলার প্রাণপণ চেষ্টা করছে।

পাশের ঘরে থাকে হেমেন। তার স্ত্রী রমার সঙ্গে এতদিন খুব ভাব ছিল লতার।

সেদিন তার ঘরে গিয়ে দাঁড়াতেই রমা মুখ কালো করে বলে, উনি বলছিলেন, তোমার কারো ঘরে না যাওয়াই উচিত।

—আমি খুব সাবধান থাকি। ওষুধ দিয়ে হাত ধোয়া, কাপড় ছাড়া...

—তবু বলা তো যায় না!

লতা নিরবে খানিকক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলে, বেশ,

কোমরে আঁচল জড়িয়ে ক্ষিণাঙ্গী লতা সোজা হয়ে দাঁড়ায়, ধমক দিয়ে বলে, ছাখো তুমি রোগী মানুষ, তোমার অত বাহাদুরী কেন? তুমি চুপ করে থাকো। আমাকেও তুমি ভড়কে দিচ্ছ!

—তুমি আর কি করবে বল?

—চেষ্টা তো করবো?

—না। মিছে চেষ্টা করে লাভ নেই। যেটুকু সম্বল আছে তাতে এ রোগ সারে না। এ সেন্টিমেন্টের ব্যাপার নয় লতা, জেনে শুনে সম্বলটুকু খুইয়ে তুমি পথে বসতে পাবে না। সামান্য একটু চান্স থাকলেও বরং কথা ছিল।

লতা আবার ধমক দেয়, চুপ করবে তুমি? কে বললে তোমার চান্স নেই? রোগ বাধিয়ে এখন কর্তালি করতে এসো না। আমায় বুঝে শুনে ব্যবস্থা করতে দাও। মাথা ঠাণ্ডা রেখে আমায় সব করতে হবে, আমার মাথা গুলিয়ে দিও না।

মাথা উঁচু করে সে আবার বলে, তেমন মেয়ে পেয়েছ নাকি আমায়, চেষ্টা না করেই হাল ছেড়ে দেব?

মুখে যাই বলুক হারাণ, মৃত দেহে সে যেন একটু প্রাণ পায়।

লতা বলে, আপিস থেকে লোন টোন যে বাবদে যতটা পার ব্যবস্থা করবে। লম্বা ছুটির দরখাস্ত করবে।

—ছুটি? ছুটি নিলে মাইনে পাব না।

—জানি। সে ভাবনা তোমার নয়। আপিসেও খাটবে, অসুখও সারবে, না?

আগে চাই টাকা, তারপর অন্য কথা। যেখানে যেভাবে যতটুকু পাওয়া সম্ভব, লতা টাকা কুড়োতে আরম্ভ করে। বাপ গরীব, টাকা দেবার সাধ্য নেই, লতা বাচ্চা দুটিকে মার কাছে রেখে আসে। ওদের

এ জন্মে আর ঢুকবো না তোমার ঘরে।

অন্য ভাড়াটেরা গিয়ে চাপ দেয় বাড়ীওলা নন্দকে। নন্দ এসে বলে, দেখুন, আপনাদের অন্য কোথাও চলে যাওয়া উচিত। আপনারা না গেলে অন্য সবাই চলে যাবেন বলেছেন।

লতা বলে, আমরা চলে যেতেই চাচ্ছি। একটু আলোবাতাসওলা ঘর খুঁজছি—পেলেই উঠে যাব। আপনারা দিন না খোঁজ করে?

নন্দ বলে, একি একটা কথা হল? মনের মত ঘর না পেলে আপনারা যাবেন না, এতগুলি লোকের অসুবিধা করবেন? দু'চারটা দিন দেখে আমি কিন্তু বাধ্য হয়ে—

বাধ্য হয়ে সে যে কি করবে না বললেও বোঝা যায়। অন্য সব ভাড়াটেরা তার পক্ষে, কাজেই তার জোর বেড়েছে।

লতা ভয় পায় সত্যই কিন্তু বাইরে তেজ দেখিয়ে বলে, সে আপনি যা পারেন করবেন। ঘর না পেলে রোগা মানুষটাকে নিয়ে আমি রাস্তায় নামব নাকি? নিয়ম মত ভাড়া গুনছি না?

শচীন একটা মীমাংসা করে দেয়। বলে, দেখুন, বাবাকে বলে ছাতে আমি একটা শেড তুলে দিচ্ছি। যতদিন ঘর না পান ওই-খানেই আপনারা থাকুন? তাছাড়া, অন্য বাড়ীতে ঘর ভাড়া নিলেও এই ব্যাপার ঘটবে। একেবারে সেপারেট একখানা ঘর পাওয়া মুস্কিলের কথা।

লতা চোখ তুলে তাকায়। শচীন তার দিকেই চেয়ে আছে। চোখের লোভটুকু বোধ হয় নিছক অভ্যাস। কারণ তার সহানুভূতি যে খাঁটি তাতে সন্দেহ নেই।

সে বলে, তাই দিন। আমার আলো বাতাসের সমস্যাও মিটবে।

ভাড়াটেরা এ ব্যবস্থা মেনে নেয়। কারণ শচীন বলেছে যে ছাতে

জলের ব্যবস্থাও সে করে দেবে, লতাকে জলের জন্য নীচে এসে সকলকে ছোঁয়াছুঁয়ি করতে হবে না। সকলের কাছ থেকে প্রায় পৃথক হয়েই থাকবে লতারা।

লতার জলের সৌভাগ্যে কারো কারো মনে বেশ ঈর্ষাও জাগে।

কয়েকদিন পরে জিনিষ পত্র নিয়ে হারাণ ও লতা খোলা ছাতে টিনের চালের অস্থায়ী ঘরখানায় উঠে যায়।

হেমেন শচীনকে জিজ্ঞাসা করে, সারবে?

শচীন বলে, সব নির্ভর করছে চিকিৎসা চালিয়ে যাবার ওপর। অনেকদিন টানতে হবে। বিষম খরচ।

হেমেন বলে, তা হচ্ছে। ভদ্রলোক সত্যি ভাগ্যবান—এমন চালাক চতুর স্ত্রী পেয়েছিলেন। রমা বলে, আগে মোটেই এরকম ছিল না। হারানবাবুর অসুখটা ধরা পড়বার পর কেমন অদ্ভুত রকম পালটে গেছে।

রীতিমত বিস্ময়ের সঙ্গেই সকলে এটা লক্ষ্য করেছিল। সমস্ত দায়িত্ব লতা একা নিয়েছে, একা সব পালন করে চলেছে। বাইরে গিয়ে ওষুধ পথ্য কিনে আনা থেকে হারানের সেবাশুশ্রূষা সব কিছু দায়িত্ব। চিকিৎসা আর আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাগুলি যে সত্যই কি রাজসিক ব্যাপার সেটা কারো অজানা নেই। মেয়েরা কৌতূহলের বশে একে একে সকলেই লতার কাছ থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিয়েছে কি দিয়ে কি হয় এবং কিসে কি লাগে।

লতা কিছুই গোপন করে নি।

বরং যারা গোড়ায় আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে বাড়ী থেকে তাদের তাড়াতে ব্যাকুল হয়েছিল, জিজ্ঞাসাবাদের মধ্যে তাদের যে সমবেদনা প্রকাশ পায় তাতে সে খুসীই হয়।

কিন্তু লোকের মনে প্রশ্ন জাগে, কতদিন এভাবে চালাবে লতা?

কি করে চালাবে ?

তার অবস্থাও তো কারো অজানা নয় !

তাই মাস দুই পরে লতার মুখে দুশ্চিন্তার কালচে ছায়া পড়েছে দেখে রমা হেমেনকে বলে, আর বুঝি টানতে পারছে না বেচারা।

হেমেন বলে, কি করে টানবে ? এ তো জানা কথাই।

অনেকক্ষণ ইতস্তত করে সেদিন প্রথম রমা ছাতে যায়—স্নান করার আগে যায়—নীচে নেমেই সাবান মেখে নেয়ে সব ছোঁয়াছুঁয়ি ধুয়ে ফেলবে।

রমা বলে, কি করে খরচ চালাচ্ছ ?

লতা বলে, যা ছিল ফুরিয়ে এল। এবার কিছু করতে হবে।

—কি করবে ?

—দেখা যাক। একটা উপায় করতেই হবে।

রমা দারুন অস্বস্তির সঙ্গে ভাবে কে জানে কি উপায়ের কথা ভাবছে লত। নিরুপায় মেয়েমানুষ, ভেবে সে কি উপায় বার করবে !

কয়েকদিন পরে বাড়ীর সকলে লক্ষ্য করে যে সকালে ঘরের রান্নাবান্না কাজ কর্ম সেরে সাড়ে দশটা এগারটার সময় লতা বেরিয়ে যায়।

ফিরে আসে সন্ধ্যার সময়।

—কি ব্যাপার ?

রমাই তাকে জিজ্ঞাসা করে সকলের আগে।

লতা বলে, একটা কাজ পেয়েছি।

—কি কাজ ?

লতা একটু ইতস্ততঃ করে বলে, একজনের বাড়ীতে নার্সিং-এর কাজ।

এরপর বেশী সে আর কিছু বলে না।

দিন যায়। একটা লেডিজ ব্যাগ হাতে লতা রোজ নিয়ম মত

বেরিয়ে গিয়ে ফিরে আসে। হারাণের চিকিৎসা পুরো হয়ে চলে। ধীরে ধীরে তার শরীরে অস্বাস্থ্যের ক্লিষ্ট ছাপ কেটে গিয়ে স্বাস্থ্যের জ্যোতি ফিরে আসতে থাকে।

সকলে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে: নার্সিং-এর কাজ? জীবনে প্রথম রুগ্ন স্বামীর সেবা আরম্ভ করেই কি এমন ট্রেইন্‌ড নার্স হয়ে গেল যে তাকে এত টাকা মাইনে দিয়ে লোকে রেখেছে, হারাণের চিকিৎসার বিরাট খরচ যাতে চালানো যায়?

হেমেন রমাকে বলে, তুমিও যেমন, ওই কথা বিশ্বাস করলে। বয়স আছে, চেহারাটা মন্দ নয়—

তাই কি? স্বামীর প্রাণ বাঁচাতে নিজেকে এই ভাবে বলি দিতে হয়েছে লতাকে?

রমা একটা নিঃশ্বাস ফেলে।

শচীনও ভাবছিল, ব্যাপারটা কি?

লতার মুখে যখন দুশ্চিন্তার কালো ছাপ পড়েছিল, একদিন কয়েকখানা নোট পকেটে নিয়ে শচীন বিকেলের দিকে তার কাছে গিয়েছিল। হারাণ তখন বেড়াতে গেছে।

বলেছিল, দেখুন, আমিও এ রোগে মরতে বসেছিলাম। আমার কাছে টাকা নিলে কোন দোষ নেই।

লতা বলেছিল, আপনি অনেক করেছেন। আমি চিরজীবন কৃতজ্ঞ থাকবো। টাকার দরকার নেই।

তবু শচীন নড়ে না দেখে লতা বলেছিল, টাকা দিয়ে কেনার মানুষ আমি নই শচীনবাবু।

শচীনের রাগ হয়েছিল খুব। তারপর আর কোন খবর নেয় নি। পথে মুখোমুখী হলেও যেচে কথা বলে নি।

কিন্তু সেদিন বিকালের দিকে এমন ভাবেই তাকে মুখো মুখি হতে হল লতার যে রাগ নিয়ে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সাধ্য তার হল না।

জনাকীর্ণ রাজপথ। তারই ধারে ফুটপাতে কম্বল বিছিয়ে লতা বসে আছে। তার পিছনে দেয়ালে হেলান দিয়ে রাখা মস্ত একটা বিজ্ঞাপন।

"যক্ষ্মা নিবারণী মহাকর্কট বটিকা।

এই বটিকায় আমার স্বামীর যক্ষ্মা সারিয়াছে।

সপ্তাহে একটি বটিকা সেবনে যক্ষ্মার ভয় থাকে না।

প্রতি বটিকা—এক আনা

কত পয়সা কতদিকে যায়—সপ্তাহে এক আনা খরচে মহারোগ ঠেকান।"

শচীন এক দৃষ্টে চেয়ে থাকে। লতা একটু হাসে।

তখন আপিস ছুটি হয়েছে। বিক্রীর সময়। খানিক তফাতে শচীন অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে থাকে।

সন্ধ্যার খানিক আগে লতা উঠে বিজ্ঞাপনটি ভাঁজ করে, কম্বলটি তুলে গুটিয়ে নেয়, ব্যাগটি হাতে করে এগিয়ে ট্রামের অপেক্ষায় দাঁড়ায়।

শচীন কাছে গিয়ে বলে, এতে সত্যি সত্যি চলছে আপনার?

লতা বলে, চলছে বৈকি। হাতে কিছু পয়সাও জমেছে। আশ্চর্য হচ্ছেন কেন? যে দেশে কাসি হলে ফাঁসির আতঙ্ক জাগে, সে দেশে এক আনা খরচ করে লোকে নিশ্চিন্ত হতে চাইবে না?

শচীন বুঝতে পারে, লতা ফাঁসি বলতে টি-বির কথাই বলছে।

আর না কান্না

'কান্না' গল্পের সাত বছরের ছিচকাঁদুনে মেয়েটা মাইরি আমায় অবাক করেছে। যেমন মা-বাবা, তেমনি মেয়ে। শুধু কান্না আর কান্না।

যত চাও রুটি খাও শুনে কোথায় খুশিতে ডগমগ হবে, ভাববে যাকৃগে, আজকে পেটটা আমার ভরবেই ভরবে—তা নয়। এক মুঠো ভাতের জন্য কান্না। রেশনের চালের ভাত! রুটি এমনি চিবোলে মিঠে লাগে, একটু গুড় পেলে মাখিয়ে নিলে হয়ে যায় একেবারে পাটিসাপটা পিঠে। রুটি খেয়ে পেট ভরে জল খাও, তার কাছে নাকি ভাত খাওয়ার পেট ভরা! ছিটেফোঁটা ডাল, এইটুকু তরকারী, তাই দিয়ে ছিরি আছে নাকি ভাত খাওয়ার?

প্রাণটা ভাত চেয়ে চোঁ চোঁ করে বৈকি ভেতো মনিষ্যির। বড়দের আরও বেশি করে। কিন্তু ভাতের থালা সামনে নিয়ে বসলে প্রাণটা যে আবার লাগসই পরিমাণে ডাল তরকারী মাছ চায় মশাই! শুধু ডাল হোক, শুধু একটা তরকারী হোক, তাই দিয়ে এক দিস্তে রুটি মেরে দেওয়া যায় (যেন এক দিস্তে রুটি গরীবদের মেরে দিতে দিচ্ছে দুর্ভিক্ষ-পোষক সদাশয় কংগ্রেস সরকার)। রুটি স্রেফ ভুলিয়ে দেয় মাছের শোক। বাটিভরা ডাল নেই, ভাজা নেই (তেল লাগে!) চচ্চড়ি, শুক্ত, মরিচ ঝোল, ডালনা-ফালনার যে কোন একটা যদি থাকে তো দু'গেরাসের বেশি ভাত মাখার মত নেই, নাকে একটু আঁসটে গন্ধ নেই, —সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে রাত এগারোটায় হয় কাদার মত

গলা গলা আর নয় তো কড়কড়ে শক্ত ভাত খেতে পেয়ে কে যে সুখে একদম গদগদ হয় বাংলায় ?

ঠাণ্ডা বরফ ভাত !

সেটা ভুললে চলবে না। রান্না হয় সন্ধ্যায়—গুদাম-পচা সরকারী চালের বোঁটকা গন্ধেই বুঝি ন্যাকা মেয়ের ভাতের জন্য কান্না বাড়ে ! কর্তাকে গরম গরম ভাত দিয়ে খুশি করতে যে গিন্নি রাত এগারোটা পর্যন্ত উনানে কয়লা পোড়াবে, তাদের বাঁচিয়ে রাখতে যে কর্তা ব্যক্তিটা সকাল আটটা থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত খেটে মরে সে মানুষটা গিন্নির সাথে কাব্যি করবে না, মারবে এক চাঁটি।

গা-ঘেঁষা ঘর। যতীনের এক গণ্ডা ছেলেমেয়ে আব্দার তোলে শুনতে পাই, এবেলা রুটি কর মা, রুটি কর। কর না রুটি ? আটা কম তো কম করে কর না ! ভাতের সঙ্গে একটা দুটো করে খাব।

বাবারে বাবা, কি রুটিই তোরা খেতে পারিস !

একটা করে দিও ?

দাঁড়া দেখি হিসেব করে।

হিসাব ছাড়া পথ নেই। সব বিষয়ে সব কিছুর গোনা-গাঁথা ওজন করা হিসাব দিয়ে কোনমতে দিন গুজরান। আটার পরিমাণ দেখে অবলা তার জীর্ণ পুরনো সেলাই করা ব্লাউজটা গা থেকে খুলে ফেলে দিতে দিতে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে।

নাঃ, এবেলা রুটি হবে না।

শুধু এবেলা নয়, এ হপ্তার বাকী কটা দিন আর রুটি পাবে না কেউ, ভাতের সঙ্গে দু'খানা একখানাও নয়। সকাল আটটায় বেরিয়ে রাত এগারোটায় ফিরবে যে মানুষটা, ক'দিন তার বাইরে খাবার জন্য রুটি করে দিতেই এ আটাটুকু লেগে যাবে। বাইরে কিনে খেতে

বড্ড খরচ।

তবু আব্দারের কলরব ওঠে—ছোট দু'জনের। তারা এখনো ভাব-জগতের মায়া একেবারে কাটিয়ে উঠে বাস্তব জগতের কঠোরতা সম্পূর্ণ মানতে পারে নি, এখনো বুকে আশা নিয়েই আব্দার করে। তবে এক ধমকে তারা থেমে যায়।

সাত বছরের মেজ মেয়েটা ফোঁস করে ওঠে, তুমি সব বাবার জন্যে রেখে দেবে। আমরা ভেসে এসেছি? বাবা বলে কত কিছু কিনে খায়—

তার গালে একটা চড় পড়ে সশব্দে।

চড়চাপড় এই মেয়েটাই খায়। ওর স্বাস্থ্যটাই ভাল, খিদেও বেশি—ওই বেশি খাই খাই করে। অন্য তিনজনেই রোগা দুর্বল—দশ বছরের বড় মেয়েটা তো প্যাঁকাটির মত দেখতে। ওদের গায়ে হাত তুলতে ভরসা হয় না—হয়তো মরেই যাবে, খিদেয় কাতর বাপের চড় খেয়ে চাষীর যে-ছেলেটার মরে যাবার খবর খবরের কাগজে বেরিয়েছে, তার মত।

অন্য তিনজনকে বশে আনতে অনেক সময় শাসন জোটে একা ওই সাত বছরের মেজ মেয়েটার।

রোগা ক্ষীণজীবী বড় মেয়েটা দু'চারখানা বাসন মাজে, ঘটীতে করে জল তোলে, ঘর ঝাঁট দেয়, দোকানে যায়। পুতুল খেলা ফেলে মেজ বোন দিদির সাথে হাত লাগায়। পুতুল খেলার চেয়ে তার ভাল লাগে টুকটাক সংসারের কাজ করার খেলা।

সে দিদির কাজ করে, মার কাজ নয়। মার সঙ্গে তার বিবাদ। সে মিনতি করে বলে, দিদি, আমায় দেনা বাটিটা মাজি।

মা বাটিটা এগিয়ে দিতে বললে সে শুনতে পায় না। ধমক

দিয়ে হুকুম করলে অনিচ্ছার সঙ্গে ওঠে, পুতুলকে বলে যায়, খেল বাছা একটু, পরে খেতে দেব। রাক্ষুসী ডাকছে।

আটটা বাজবার আগেই ঝিমিয়ে নেতিয়ে আসে চারজন। সেটাও মেজাজ বিগড়ে দেয় অবলার, কিন্তু বেচারীরা করবে কি? খাদ্যে মেটে ক্ষয়ের পূরণ আর পুষ্টির প্রয়োজন-ঘুম তাই ঘনিয়ে আসে আরও বেশি ক্ষয় ঠেকাতে। এ বিষয়ে প্রকৃতি ছেড়ে কথা কয় না কাউকে। ওই তেতলা বাড়ীর ভুঁড়িওলা মালিক ঘনশ্যামবাবু; সাতজন ভাড়াটের কাছে লোকটা মাসে বাড়ী ভাড়াই পায় চারশ' টাকার মত—অনিদ্রা রোগ খুব বেশি বেড়ে গেলে মাঝে মাঝে তাকেও মাছ মাংস মিঠাই মণ্ডা একেবারে বাদ দিয়ে উপোস করতে হয়! অতিপুষ্ট শরীরটা তার যথারীতি পুষ্টি না পেয়ে আপোষে একটু ঘুম এনে দিয়ে নিদ্রা-হীনতার অসহ্য কষ্টে তাকে পাগল হতে দেয় না।

চারজনে একসঙ্গে খেতে বসে। তার মানে চারজনকেই একসঙ্গে বসানো হয়, একসঙ্গে চুকিয়ে দিলেই হাঙ্গামা চুকে যায়।

অবলারও সহ্যর সীমা আছে তো।

আমি আলু পাইনি মা!

আমায় ডাঁটা দিলে না যে?

এট্টুখানি ডাল দাও মা, শুধু এট্টুখানি!

পেট ভরেনি!

আমারও ভরেনি!

খা। খা। খা। আমার হাড়মাস চিবিয়ে খা তোরা।

রোগা বড় মেয়েটা চুপচাপ খায়। এবার সে তার ক্ষীণকণ্ঠে যতদূর পারে চড়িয়ে বলে, তুমি যেন কেমন কর মা। রুটি দিলে না একখানা, আরেক হাতা করে ভাত দাও না আমাদের? খিদের চোটে রাতে

ওরা কাঁদলে ফের মারবে তো ?

ঘরে বসে মেয়েটাকে যেন চোখের সামনে দেখতে পাই। একটু বাঁকা মেরুদণ্ডটা সে সোজা করেছে। শীর্ণ মুখে যেটুকু ক্ষোভের স্ফুরণ হয়েছে, খাঁটি দরদীর চোখ জোড়া নজরেই পড়বে না। ছোট ছোট চোখ, সে চোখে ভৎর্সনার ঝিলিক দেখে কালো হরিণ চোখের কথা ভুলে গিয়ে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ নতুন প্রতিবাদের কবিতা লিখতেন।

তোমরা সব চেটেপুটে খাবে, আমরা উপোস দেব ? ভাখ তো হাঁড়িতে ভাত আছে কতটুকু ? তোদের জন্যে ছ'বেলা হাঁড়ি ঠেলছি, আমি খাব না ? সারাদিন হাড়ভাঙা খাটছে, সে মানুষটা খাবে না ?

মাকে কৈফিয়ৎ দিতে হয় ছেলেমেয়ের কাছে, প্রচার করতে হয় যে মা হওয়া কি মুখের কথা। বাপ হওয়া কি সহজ কাজ! মায়ের কত ত্যাগ, বাপের কত ত্যাগ, তাতেই মুগ্ধ সন্তুষ্ট থাকা উচিত সন্তানের।

মেজ মেয়েটা ছ্যাঁচোড়। সভ্যতা ভব্যতা ভদ্রতা কিছু শেখেনি সাত বছর বয়সে। সে ফ্যাঁস করে ওঠে, ইস্! তোমরা খাবে নাখাবে আমাদের কি ? আরও ভাত রাঁধনি কেন ? তোমরা খাও না যত খুশি, আমরা না করেছি ? আমাদের খালি মারবে, আমাদের খালি পেট ভরে খেতে দেবে না!

হে রাত আটটার তারায়-ভরা আকাশ, একবার বিদীর্ণ হও। কোটি বজ্রের গর্জনে ফেটে চৌচির হয়ে যাও। আমার বাংলার ছেলেমেয়েরা আজ খিদেয় কাতর হয়ে একখানা রুটির জন্য, এক মুঠো ভাতের জন্য সংগ্রাম শুরু করেছে নিরুপায় মায়ের সঙ্গে!

রাত সাড়ে দশটা নাগাদ বাড়ী ফিরে জামাকাপড় ছেড়ে যতীন ছ'দণ্ডের জন্য আমার ঘরে বসে। আড্ডা দিতে নয়—সারাদিন যা করেছে

তার একেবারে বিপরীত কাজ আহার এবং নিদ্রার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে। যে খাটে সে জানে যে খাটুনি শেষ করেই খিদের চোটে দিশেহারা হয়ে খেতে নেই।

তাতে অসুখ হয়। শোষণের স্তর থেকে একেবারে পোষণের স্তরে আছাড় খেয়ে পড়লে সামঞ্জস্য ঠুনকো কাঁচের মত ভেঙে চৌচির হয়ে যায়।

আমার দেওয়া বিড়িটা ধরায়। টানতে গিয়ে কাশে। গায়ে বাতাস লাগায়। হাঁফ ছাড়ে। দেহ মনের টান করা তন্ত্রী আর স্নায়ুগুলি ঢিল করে দেয়। আমার চোখের সামনে দু'দণ্ডে জীবন্ত মানুষটা ঝিমিয়ে নেতিয়ে আসে! এও বাঁচার লড়ায়ের কৌশল। সকাল থেকে চলেছে সক্রিয় লড়াই—এখনকার লড়াই নিষ্ক্রিয় বিরামের। চিন্তা ভয় ক্ষোভ দুঃখ স্নেহ-মমতা আনন্দ উদ্দীপনা ন্যাকামি কোন অজুহাতেই আর একবিন্দু বাড়তি শক্তি ক্ষয় করা নয়।

খেতে বসেই টের পায় নিজের ভাগ কমিয়ে অবলা তার পাতে ভাত বেশী দিয়েছে। দুটো রসগোল্লা নয়, পেটে খিদে নিয়ে পেট ভরবে না জেনে দু'মুঠো ভাত বেশী দেওয়া। এ ত্যাগের আগের দিনের মূল্য দেবার সাধটা মনের কোণে একবার উঁকি দিয়ে যায় বৈকি, দরদ দেখিয়ে বলতে ইচ্ছে হয় বৈকি যে তুমি আমায় রাক্ষস বানাবে!

কিন্তু সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে নিছক আগের দিনের জের টানার জন্যেই ন্যাকামি করা কি পোষায় মানুষের?

খেতে শুরু করে খাঁটি দরদ দেখিয়ে বলে, তুমিও বসে যাও? মিছে রাত করবে কেন?

হ্যাঁ, আমিও বসি।

ফাঁকা আদর আর মিছে চোখে জল আনার চেয়ে কত মনোরম এই বোঝাপড়া। ভোরে উঠে উনান ধরাতে হবে অবলাকে, রাতের আবছা আঁধার বজায় থাকা ভোরে। তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে তাকে বিশ্রাম করতে বলাটাই সবচেয়ে সুমিষ্ট আদর।

অবশ্য অবস্থাটা এরকম বলে।

তারা শোয়। তাদের চোখে গাঢ় ঘুম ঘনিয়ে আসে। ঘুমোতে কেন, শ্বাস উঠে মরতেও দু'চার মিনিট সময় লাগে মানুষের। সেই ফাঁকে মেজ মেয়েটা উঠে চলে যায় রান্নাঘরে।

খিদের আগুনে পুড়ে গিয়েছে তার ঘুম। অন্ধকারে কোথায় গেল, কি করতে গেল মেয়েটা? অবলাই ওঠে গায়ের জোরে। বলে, মাগো, আর তো পারি নে!

রুটি পায়নি মেজ মেয়েটা। অন্ধকারে আটা নিয়ে সে জলে গুলে খাচ্ছে। খানিক ছড়িয়েছে মেঝেতে।

এঁটো হাতাটা তুলে নিয়ে অবলা প্রাণপণে বসিয়ে দেয় তার পিঠে। আর্ত কান্নায় চিরে যায় রাত্রির অন্ধকার।

হট্টগোলে চমকে জেগে কেঁদে উঠেই কান্না থামায় ক্ষীণজীবী রোগা বড় মেয়েটা।

রান্না ঘরে গিয়ে ছাখে কি, বোনটি তার আকাশ-চেরা গলায় চেঁচাতে চেঁচাতে আটার হাঁড়িটা কাত করে ফেলে হাতপা ছুঁড়ে তছনছ করে উড়িয়ে দিচ্ছে আটাগুলি, বাবা তার দাঁড়িয়ে আছে পুতুলের মত, মা হাতাটা উঁচু করেছে মেয়েকে আরেক ঘা বসিয়ে দেবার জন্য।

রোগা মেয়েটা দু'হাতে হাতাটা চেপে ধরে কেড়ে ছিনিয়ে নেয়। যাকে মারবার জন্য হাতা উঁচু করা, হাতা-ধরা হাত দুটো তারই মায়ের, তাই রোগা কাঠি মেয়েটার ক্ষীণ শক্তিটুকুই হাতাটা কেড়ে

নেবার পক্ষে যথেষ্ট হয়। সপ্তমে তোলা তীক্ষ্ণ বাঁশীর আওয়াজে বলে, পেতলের হাতা দিয়ে মারলে যে মরে যাবে মা ?

ও ! বড় যে দরদী আমার।

বলে রোগা মেয়েটার গালে চড় কষিয়ে দেবার জন্য অবলা হাত তুলেছে, যতীন তার হাতটা চেপে ধরে।

কি করছ ?

অবলা ঠাণ্ডা হয়ে বলে, আর সয় না, এবার আমি মরব !

মেয়ে বলে, মরবে তো নিজে নিজে মর না? আমাদের মারছ কেন।

মরব না সস্তায়

বলে কিনা, চুলোয় যাক তোমার ঘর সংসার! আমি এত খেটে খেটে মরতে পারব না।

দু'জনেই বলে, যখন তখন—যে যাকে যখন বলার একটা সুযোগ বা অজুহাত পায়। পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চুলোয় পাঠাবার জন্যই যেন এতকাল ধরে গায়ের রক্ত জল করে তারা দু'জনে সংসারটা গড়ে তুলেছে, টিকিয়ে রেখেছে।

রেশন হয় তো না আনলেই নয়।

হৃষিকেশ বলে, সংসার টানার জন্য খাটব গাধার মত, আবার রেশন আনতে বাজার করতেও ছুটতে হবে আমাকেই? ছেলেরা যেতে পারে না? কোথাকার নবাব এসেছে?

মোহিনী বলে, আমার হয়েছে সব দিকে জ্বালা। দুদিন বাদে ওদের পরীক্ষা নেই? রাত জেগে জেগে কি চেহারা হয়েছে দেখতে পাওনা? রেশন আনার কথা বলতে গেলে খেঁকিয়ে উঠবে।

হৃষিকেশ বলে, মেয়ে দুটোকে পাঠাও। বাপের ঘাড়ে গিলবে আর মুটোবে, রেশনটা নিয়ে আসুক।

মোহিনী ঝংকার দিয়ে বলে, হঁ্যা, ওই ধুমসো দুটো মেয়ে ভিড়ের মধ্যে যাবে রেশনের জন্য ধন্না দিতে! কাণ্ডজ্ঞানও হারিয়েছ নাকি তুমি?

—চুলোয় যাক তোমার ঘর সংসার, আমি এত খেটে খেটে মরতে পারব না!

বলে' গজর গজর করতে করতে হৃষিকেশ টাকা আর থলি হাতে নিয়ে রেশন আনতে যায়।

স্কুল কলেজ আপিসের তাড়ায় বিব্রত মোহিনী রান্নাঘর থেকে বড় মেয়েকে ডেকে বলে, শুভা, চট করে মসলাটা বেটে দে আমায়। এক হাতে কত করব ?

শুভা মিনতি জানিয়ে বলে, বাবার কাছে পড়াটা একটু বুঝে নিচ্ছি মা। বাবা তো এখুনি আবার বাজারে চলে যাবে। কলেজে দেবে না, মাষ্টার রাখবে না, নিজে নিজে পড়ে কেউ প্রাইভেটে পাশ করতে পারে ? কি রেটে ফেল করছে দেখছ তো ?

মোহিনী দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড় করানো শিলটা পেতে ধুতে ধুতে ঝংকার দিয়ে বলে, একটা ঠিকে ঝি পর্য্যন্ত রাখবে না। চুলোয় যাক তোমার ঘরসংসার, এত খেটে খেটে আমি মরতে পারব না।

শুভা উঠে এসে বলে, দাও, বেটে দিচ্ছি। কাজ নেই আমার পরীক্ষা পাশ করে।

মোহিনী ধমক দিয়ে বলে, তুই পড়বি যাতো হারামজাদি। কলেজে দেয় না, মাষ্টার রাখে না, বই কিনতে কতটাকা লেগেছে হিসাব রাখিস ?

পুলক পড়া ফেলে লাফিয়ে উঠে আসে। মায়ের কাছে হাত দুটি জোড় করে থিয়েটারী ঢংএ বলে, ফেল কি আমরা ইচ্ছা করে হই মা ? আমাদের ফেল করাচ্ছে জানো না ? বাংলাদেশের ছেলেরা কি হঠাৎ বোকা হাঁদা হয়ে গেছে ? পরীক্ষা দিয়ে সত্তর পঁচাত্তর পার্সেণ্ট ফেল করে ?

এত বড় ছেলের এই অস্বাভাবিক ছেলেমানুষী ঢংটুকুই কি সয় মা মোহিনীর ? ক্ষোভ বিদ্বেষ রাগ আর নালিশ দিয়ে একটা উগ্র প্রতিবাদের মতই যে নিজেকে খাড়া রাখে সে ছেলের একটু ছ্যাবলামির

আঘাতেই যেন ঝিমিয়ে নেতিয়ে যায়, গা এলে দিয়ে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে চোখ বোজে।

ভাই বোন দুজনেই ভড়কে যায়।

শুভা ঝেঁঝে ওঠে পুলকের উপর,—তোমায় ডেকেছিলাম মুরুব্বিয়ানা করতে ? যাও না নিজের ফেলের পড়া করনা গিয়ে।

এই সরু প্যাসেজটুকু দিয়ে সকলের আনাগোনা। শিল ধোয়া জলে পায়ে পায়ে আনা ধুলোময়লার কাদার মধ্যে বসে পড়ে মাকে দুহাতে বুকে জড়িয়ে শুভা বলে, অমন কোরোনা মা! আমরা কি আগের মত বোকা হাবা স্বার্থপর আছি, তোমার কষ্ট বুঝব না ? কি করি বলো—

চোখ মেলে মেয়ের কোল থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে একটু বিহ্বলের মতন মোহিনী বলে, মাথাটা কেমন ঘুরে উঠল। কি হয়েছিল রে ? কি বলছিস তোরা ?

পরক্ষণে সে যেন ক্ষেপে যায়। গলা ফাটিয়ে বলে, তুই যে হারামজাদি কাচা কাপড়টা পরে জলকাদার মধ্যে বসে পড়লি ? কে আবার কাচবে তোর কাপড় ? সাবান সোডা কে যোগাবে ?

বলতে বলতে সে আবার চোখ বুজে সেই জলকাদার মধ্যেই গা এলিয়ে দেয়।

ডাক্তার আনতেই হয়। সেও আবার পেশাদার ডাক্তার!

অভয় দিয়ে বলে, ক'মাস পারফেক্ট রেষ্ট দিতে হবে। আমি একটা ভিটামিন টনিক লিখে দিচ্ছি, সেটা খাবেন। রোজ অন্তত আধ সের দুধ চাই। তার বেশী হজম হবে না তাই বিলাতী কোন পার্সিয়ালি ডাইজেষ্টেড মিল্ক ফুড—

পুলক বলে, বাবা দুটো টাকা দিয়ে ওঁকে যেতে বল।

মোহিনীর মাথায় ধার করা আইসব্যাগটা চেপে ধরে রেখে শুভা জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকে। রায় বাবুদের বাড়ীর সামনে মোটরটা দাঁড়িয়ে আছে, ভিতরের সিটে বসে সিগারেট টানছে ড্রাইভার করালী। সিগারেট টানতে টানতে দু'একবার উৎসুক চোখ তুলে জানলার দিকে তাকাচ্ছে।

ঘরের মধ্যে তাকে ভালো দেখতে পাচ্ছে না, আলো বড় কম ঢোকে ঘরে, বাতাসের মতই।

জানালায় গিয়ে যদি সে দাঁড়ায়, করালীর উৎসুক চোখ ক্ষুধাতুর হয়ে উঠবে।

শুধু চোখ। এমনিতে মুখে তার সর্ব্বদাই একটা নিশ্চিন্ত নির্লিপ্ত ভাব। রায়বাবুদের বাড়ীর মেয়েদের কাছে শুভা শুনেছে করালীর কেউ নেই, যা রোজগার করে সব নিজের জন্য খরচ হয়।

—আমাদের মত গন্ধ তেল সাবান মাখে, জানিস্? প্রথম ভাবতাম চুরি করে বুঝি। তারপর দেখা গেল, না, বাবু নিজের পয়সাতেই কেনে। ঘর ভাড়া লাগে না, খাওয়া খরচ লাগে না...

সিগারেট ফেলে দিয়ে করালী চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে। বেলা দশটা বাজে, দশ পনর মিনিটের মধ্যে রায়বাবু এসে গাড়ীতে উঠবে,—কিন্তু শুভা জানে, তারই মধ্যে করালী একটু ঘুমিয়ে নিতে পারবে। সে লক্ষ্য করেছে ফাঁক পেলে যখন ইচ্ছা করালী ঘুমিয়ে নিতে পারে।

ঠিক তাই।

করালী শুয়ে পড়ার পাঁচ মিনিট পরে রায়বাবু বেরিয়ে আসে, করালীর ঘুম ভাঙ্গিয়ে ডেকে তুলতে হয়।

নিজের সিটে বসে গাড়ীতে ষ্টার্ট দিয়ে আরেক বার সে উৎসুক চোখে জানালার দিকে তাকায়।

শুভা ভাবে, যদি সম্ভব হত সঙ্গত হত তার সঙ্গে করালীর কথা বলা, তাকে তার মনের কামনা জানানো! যদি সম্ভব হত, সঙ্গত হত করালীকে তার জানানো যে তার মনের ইচ্ছায় তারও সায় আছে। অনায়াসে করালী কোন আত্মীয়কে দিয়ে প্রস্তাব পাঠাতে পারত তার বাবার কাছে, তারপর শুভ হোক অশুভ হোক কোন এক লগ্নে বাবার ঘাড় থেকে তার দায় নামত আর তাদের দুজনেরি সাধ আর সমস্যা মিটে যেত।

একার আয় একা ভোগ করার বদলে তার বোঝা ঘাড়ে নিয়ে কত খুসী আর কৃতার্থ হত করালী।

রায়বাবুদের পেট মোটা বিড়ালটা অনেকক্ষণ থেকে ঘরের আনাচে কানাচে শুঁকে বেড়াচ্ছিল। এ বাড়ীতে আঁসটে গন্ধ পাওয়া যায় কদাচিৎ, দুধ রাখা হয় নামমাত্র, কে জানে বড়লোকের বাড়ীর পোশা আদুরে বিড়াল এ বাড়ীতে এসেছে কেন। মাছ দুধ এঁটোকাঁটার লোভে পরের বাড়ী যাবার কোনই দরকার তো ওর নেই!

বিড়ালটা লাফ দিয়ে তাকে উঠে সেখান থেকে পুরানো ভাঙ্গা আলমারিটার উপরে উঠে যেতে দেখে শুভা বুঝতে পারে, বাচ্চা পাড়ার জন্য সে নিরাপদ স্থান খুঁজছে।

গতবার ওর বাচ্চাগুলিকে রায়বাবুরা মেরে ফেলেছিল। কিন্তু একটা বিড়াল কি করে টের পেল যে এত ছ্যাঁকা পোড়া খেয়েও তাদের প্রাণটা কোমল রয়ে গেছে, তার বাচ্চাগুলিকে মারবার মত নিষ্ঠুর তারা হতে পারবে না?

বাইরে কড়া নড়তে শুভা জিজ্ঞাসা করে, কে?

বলে, আমি রায়বাবুদের রাঁধুনী। ওদের বিড়ালটাকে খুঁজছি।

শুভা অবাক হয়ে যায়—রায়বাবুদের নতুন রাঁধুনীর এমন চেনা গলা !
উঠে গিয়ে দরজা খুলে সে হাঁ করে চেয়ে থাকে।

সুরমা বলে, তোমাদের বাড়ী নাকি এটা ?

শুভার গলায় কথা জড়িয়ে যায়, কোনমতে সে বলে, ভেতরে আসুন দিদিমণি, বিড়ালটা এসেছে।

কতদিন আর হবে, সুরমার কাছে স্কুলে বাংলা পড়ত। সব দিদিমণির চেয়ে তারই বোধ হয় মেজাজ ছিল কড়া আর ধমক ছিল বেশী। সিঁথিতে সরু করে সিঁদুর দিয়ে চওড়া পাড় শাড়ী পরে স্কুলে আসত।

আজ তার পরণে থান, সে রাঁধুনীগিরি করছে রায়বাবুদের বাড়ী।

ভিতরে গিয়ে মাথায় আইসব্যাগ বসানো মোহিনীকে দেখে সুরমা বলে, তোমার মা বুঝি ? কি অসুখ ?

শুভা বলে, না খেয়ে খাটুনি চিন্তাভাবনা—মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু দিদিমণি আপনি রান্নার কাজ নিলেন কেন ?

এ প্রশ্ন যে উঠবে এবং জবাবও একটা দিতে হবে সে তো জানা কথাই। তবে পাড়ার লোকের রাঁধুনী হিসাবে বাড়ীর দরজায় তাকে হাজির হতে দেখে যেরকম থতমত খেয়ে গিয়েছিল তাতে এত শীগগির এমন স্পষ্টভাবে সে প্রশ্নটা করে বসবে, সুরমা সেটা ভাবতেও পারে নি।

সে-ই বরং ভাবছিল কিভাবে কথাটা তুলে এককালের ছাত্রীকে সংক্ষেপে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেওয়া যায়।

সুরমা ধীরে ধীরে বলে আর বলো কেন, স্কুল থেকে বিদায় করে দিলে। আরেক জায়গায় কাজ জোটাবো তবে তো ? কিন্তু ছেলেপুলে নিয়ে খাই কি ! বসে থাকলে কি আমাদের চলে ? ওদের রাঁধুনীটা পাড়ায় থাকে, কাজ ছেড়ে দেবে শুনে ভাবলাম আমিই ঢুকে পড়ি।

আমার পেটটা তো চলবে, মাস গেলে কটা টাকা তো পাব। দুবেলা রাঁধি, দুপুরবেলা কাজের খোঁজে বেরোই।

শুভা বার বার তার পরণের ধুতিটার দিকে তাকাচ্ছে খেয়াল করে সুরমা একটু হাসে।

বলে, না, বিধবা হইনি, উনি বেঁচেই আছেন। বসে খাচ্ছেন বলে রাগ করে বিধবার বেশও ধরিনি। রাঁধুনীটা বল্‌লে কি, এরা সধবা লোক রাখে না, সধবার নাকি অনেক ঝনঝাট। বিধবারা অনেক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়। তাই বিধবা সাজলাম।

শুভা জিজ্ঞাসা করে, মন খুঁত খুঁত করল না?

সুরমা অবজ্ঞার সঙ্গে একটু মুখ বাঁকিয়ে যেন মনের খুঁতখুতানি উড়িয়ে দিয়েই বলে, গোড়ায় একটু করেছিল, তারপর ভাবলাম, কি হয় ওতে? একটু সিঁদুর না দিলে আর শাড়ীর বদলে ধুতি পরলেই যদি স্বামীর অকল্যাণ হত—

কথা সে শেষ করে না, আলমারীর উপর থেকে বিড়ালটাকে নামিয়ে নিয়ে বলে, না যাই এবার। উনান কামাই যাচ্ছে। একটা বিড়ালের জন্য কি মায়া। অনেকক্ষণ দেখা নেই কোথায় গেল— এবাড়ী ওবাড়ী একটু খুঁজে এসো। রাঁধুনীকে ওরা একেবারে মানুষ ভাবে না। আগে ভাবতাম বড়লোক সেক্রেটারীর কাছে টিচাররাই বোধ হয় মানুষ নয়, এখন দেখছি গরীব হলেই মানুষ থাকে না। খানিকক্ষণ বেড়ালের দেখা নেই—অমনি হুকুম, খুঁজে নিয়ে এসো।

কি ঝাঁঝ সুরমার কথায়! শুভা টের পায় সুরমার গরম মেজাজটা পরিণত হয়েছে ঝাঁঝে। তার মার মেজাজের সঙ্গে খানিকটা যেন মিল ছিল বাড়ীর ছেলেপুলে আর স্কুলের মেয়েদের ঝনুঝাটে তার কষে যাওয়া মেজাজের।

এক বাড়িতে

বিলাসময়ের স্ত্রী সুরবালা শুনে বলে, না, আত্মীয়-বন্ধুর সঙ্গে দেনা পাওনার সম্পর্ক করতে নেই। বড় মুস্কিল হয়। বাইরের লোকের সঙ্গে সোজাসুজি কারবার, যা বলবার স্পষ্ট বলতে পারবে। আত্মীয় বন্ধুর কাছে চক্ষুলজ্জায় মুখ ফুটবে না, বন্ধুকে ভাড়াটে করে বাড়ীতে এনে কাজ নেই।

: বড় মুস্কিলে পড়েছে বেচারা—

: পড়ুক। অমন কত লাখ লাখ লোক ঢের বেশী মুস্কিলে পড়েছে। বন্ধুকে অন্য বাড়ী খুঁজে দাও, নিজের বাড়ীতে ও-ঝঞ্ঝাট ঢুকিয়ে কাজ নেই।

বিলাসময়ও যে কথাটা এদিক থেকে বিবেচনা করেনি তা নয়। সুধীর অনেক দিনের বন্ধু—গলায় গলায় ভাব। সেলামীর কোন প্রশ্নই ওঠে না কিন্তু ওকে ঘর দু'খানা ভাড়া দিলে একপয়সা আগাম নেওয়া যাবে না, সময়মত ভাড়া না দিলে দাবড়ানি দেওয়া যাবে না, উঠতে বসতে সব বিষয়ে বন্ধুত্বের মর্যাদা রেখে চলতে হবে।

কিন্তু অন্তরঙ্গ বন্ধু বলেই আবার মুস্কিল—রেহাই পাওয়া যায় কিসে? সুধীর এত করে বলছে, এখন তাকে না দিয়ে অন্য কাউকে ঘর দু'খানা কোন্ অজুহাতে দেওয়া চলবে?

সে তাই চিন্তিত ভাবে বলে, ও কি সহজে ছাড়বে?

সুরবালা তাকে বুদ্ধি বাৎলিয়ে দেয়। বলে, এক কাজ কর।

যা দিনকাল পড়েছে, বন্ধু বলেই তো টাকা পয়সার ব্যাপারে খাতির করা চলবে না? খুব চড়া ভাড়া চেয়ে বসো—সত্তর কি আশী টাকা। আর আগাম চাও পাঁচশো। বলবে যে একজন আগাম দিয়ে এই ভাড়ায় আসতে চায়। বন্ধু নিজেই ছাড়বে—ভাবতে হবে না!

এ মন্দ যুক্তি নয়। পাঁচশো টাকা আগাম দেবার সাধ্য যদিই বা হয় ধার করে গয়নাগাটি বন্ধক দিয়ে—মাসে দু'খানা ঘরের জন্ত আশী টাকা ভাড়া দেবার ক্ষমতা সুধীরের নেই। চরম চাহিদায় এই বাজারেও ঘর দু'খানার চল্লিশ টাকার বেশী ভাড়া হয় না—সাধ্য থাকলেও সুধীর ডবল ভাড়া দিতে রাজী হবে কেন?

ভাগ্যে এখনও ভাড়ার কথা কিছু হয়নি সুধীরের সঙ্গে। সে শুধু দাবী জানিয়ে রেখেছে যে, ঘর দু'খানা সে-ই ভাড়া নেবে। অন্ত কাউকে যেন দেওয়া না হয়। কি ভাবে বন্ধুর কাছে আগাম আর ভাড়ার কথাটা পাড়বে মনে মনে বিলাসময় তাই আওড়াতে থাকে।

পরদিনই সুধীর কথাটা পাকা করতে আসে। দু'তিন মাস তার মুখে দুশ্চিন্তার বাড়তি একটা কালো ছাপ পড়েছিল আজ দেখেই বোঝা যায় মুখ থেকে সে মেঘটা কেটে গেছে।

দেখে, বিলাসময় বড়ই অস্বস্তিবোধ করে।

ঘর দু'খানা সে পাবেই এটা নিশ্চিত জেনে বন্ধু একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে! তা, তাদের বন্ধুত্বের হিসাব ধরলে সুধীরের নিশ্চিন্ত হওয়া আশ্চর্য নয়। আর নিশ্চিন্ত হয়ে তার মুখে যে অনেকদিন পরে হাসি ফুটবে সেটাও আশ্চর্য নয়। কি অবস্থায় যে তার দিন কাটছে বিলাসময় তা ভালভাবেই সব কিছু জানে।

কি ভাবে এ অবস্থায় এসে পড়েছে সে ইতিহাসও তার অজানা নয়। জন্ম থেকে তার কলকাতায় বনবাস, পাকিস্তান-হিন্দুস্থানের

অন্য সংক্রান্তি দাঙ্গা হাঙ্গামার ধাক্কা লেগেছে তারও গায়ে। তার দাদা ভাল চাকরী করে, একখানা বাড়ী করেছে। অবশ্য স্ত্রীর নামে, নইলে সাহস করে ভাইকে একখানা ঘরে থাকতে দেখার মত উদারতাটা দেখিয়ে ফেলার ভুলটা করত কি না সন্দেহ। হঠাৎ পাকিস্তান থেকে উৎখাত হয়ে এসেছে তার শ্বশুরবাড়ীর সকলে আর ছেলেপুলে নিয়ে তার বড় মেয়ে ও জামাই।

বাড়ী থেকে সুধীরকে সে একরকম তাড়িয়ে দিয়েছে। সুধীরের মেয়েটির সন্তান সম্ভবনা সত্ত্বেও। হয়তো নিরুপায় হয়ে অগত্যাই ভাইকে এ-অবস্থায় এ-ভাবে তাড়িয়ে দিয়েছে,—নইলে শেষের দিকে ব্যবহার খারাপ হয়ে এলেও একখানা ঘরে ভাইকে সপরিবারে মাথা গুঁজে থাকতে দিতে আরও কিছুকাল হয়তো তার আপত্তি হত না।

শ্যামবাজারে বোনের বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছিল সুধীর—যে কটাদিন নিজের একটা আস্তানা খুঁজে নিতে না পারে। দু'খানা ঘরে বোনের মস্ত সংসার—তার মধ্যে আসন্নপ্রসবা মেয়েটি সমেত সুধীর মাথা গুজে আছে আজ প্রায় তিন মাস। তার ওপর স্ত্রীরও তার অসুখ।

বোন, ভগ্নীপতি আর ভাগ্নে-ভাগ্নীর মুখ গোমড়া। ভাল করে কেন কেউ একরকম তাদের সঙ্গে কথাই কয় না। শুধু গজর গজর করে।

সুধীর প্রথম কথাই বলে মারাত্মক: ঘর দুটো যখন ভাড়াই দেবে —কাল পরশু থেকে দিয়ে দাও। আজ মাসের তেইশে মিছে আর পয়লা পর্যন্ত ভোগাবে কেন! একেবারে পাগল হয়ে যেতে বসেছি।

বিলাসময় চেষ্টা করেও মুখের ভাব বা গলার স্বর স্বাভাবিক রাখতে পারে না। রীতিমত গম্ভীর হয়ে বলে, তোমাকে একটা কথা বলি। তোমার আমার মধ্যে ঢাক ঢাক গুড় গুড় কিছু নেই— আমাদের সে-সম্পর্ক নয়।

সুধীর ভড়কে গিয়ে বলে, এ যে বিষম রকম ভূমিকা করে বসলে! ব্যাপার কি ভাই?

: ব্যাপার কিছু নয়। তোমায় শুধু খোলাখুলি একটা কথা বলছি। ভাড়াটাড়ার ব্যাপারে আমি কিন্তু কোনরকম কনসেশন দিতে পারব না। অন্যের কাছে যা পাব তোমাকেও তাই দিতে হবে।

সুধীর স্বস্তি পেয়ে বলে, তাই বল! এই কথা? অন্যে যা দেবে আমিও নিশ্চয় তাই দেব। আমি চেয়েছি কনসেসন? আমিও ভাবছিলাম তোমায় স্পষ্ট বলে দেব, এ সব বিষয়ে যেন কোন রকম সঙ্কোচ কোর না। লেনদেনের ব্যাপারে বন্ধুত্ব টানতে নেই—সাফ স্পষ্ট কথা। যা পাচ্ছি তাই দেব, তোমার আর্থিক ক্ষতি করব কেন ভাই।

বিলাসময় স্ত্রীকে স্মরণ করে আন্তরিক নিশ্বাস ফেলে বলে, দিনকাল বুঝতেই পারছ। তা ছাড়া এ শুধু আমার নিজের ব্যাপার নয়—উনিও একজন কর্তাব্যক্তি।

সুধীর হেসে বলে, আমাকে কর্তা চেনাচ্ছ নাকি? আমার বাড়ীতে কর্তাব্যক্তি নেই?

সে তখনও ধারণা করতে পারেনি বিলাসময় দু'খানা ঘরের জন্যে কি অসম্ভব দাবী করে বসবে। বন্ধুর প্রস্তাব শুনে হাসি মিলিয়ে তার মুখ খানিকটা হাঁ হয়ে যায়। বিস্ময় আর অবিশ্বাস তাকে বলায়: ঠাট্টা করছ?

: না ভাই, ঠাট্টা নয়। এর কমে পারব না। কালকেই এক জন আমায় টাকাটা হাতে গুজে দিয়ে রসিদপত্র লিখে ফেলবার জন্য পীড়াপীড়ি করছিল।

: পাঁচশো টাকা আগাম? আশী টাকা ভাড়া?

সুধীরের বিস্ময় আর অবিশ্বাস যেন কিছুতেই কাটতে চায় না।

বিলাসময় তার মুখের দিকে না তাকিয়ে অন্যদিকে চেয়ে বলে, তুমি হয়তো ভাবছ, আমিও দলে ভিড়েছি, চামার হয়ে পড়েছি। কিন্তু কি করি বল? অন্যের কাছে যা পাব, তোমার বেলা কমাতে পারব না। টাকার চিন্তায় পাগল হতে বসেছি। তোমার পোষাবে না জানি, আমি বরং তোমায় কম ভাড়ায় ঘর খুজে দেব।

সুধীরের মুখে অদ্ভুত একধরনের একটু হাসি ফোটে।

: তিন মাসে খুজে দিতে পারলে না, আর কবে খুজে দেবে?

বিলাসময় কথা কয় না।

সুধীর একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। মনের ভাবের প্রতিফলনে তার মুখে যেন ঘন কালো মেঘ আর চড়া রোদের খেলা চলতে থাকে। সকলের জীবনে চারিদিক থেকে কী ভয়ঙ্কর কী বীভৎস সব অন্যায় আর অনিয়মের আবির্ভাব ঘটেছে। দিন দিন যেন ভয়াবহ হয়ে ওঠার রেটটা চড়ছে জীবনযাপনের। যুদ্ধ থেমে গিয়ে ইংরাজ চলে গিয়ে কংগ্রেস রাজা হয়েছে বলে কি এত স্বপ্নাতীত অঘটন অনিয়মও সম্ভব হতে পারে?

সুধীর বলে, ঘর খুজে দেবে বলছ, কিন্তু এই যদি ঘর ভাড়ার বাজার দর হয়, কম ভাড়ায় ঘর তুমিই বা কোথায় খুজে পাবে?

: দেখব চেষ্টা করে।

: দু'চার দশ বছর লেগে যাবে।

বিলাসময় আবার চুপ করে থাকে।

সুধীর বলে, যাক্ গে, কি আর করা যাবে। এর মধ্যে খবর পেয়ে একজন যখন পাঁচশো টাকা আগাম দিয়ে ওই ভাড়ায় ঘর দুটো ভাড়া নিতে পীড়াপীড়ি করছে, ঘর ভাড়ার বাজার দরটা এই

রকম দাঁড়িয়েছে নিশ্চয়।

বিলাসময় বেশ খানিকটা শঙ্কিত হয়ে বন্ধুর কথা শোনে। সুধীর সত্যিই তার অসম্ভব দাবী মেনে নেবে নাকি!

সুধীর আরও মিনিটখানেক ভেবে বলে, বেশ, আমি রাজী। তুমি যা চাইছ তাই দেব।

: পারবে?

: পারব—কষ্ট হবে। দিনকালটাই দুঃখ কষ্টের—উপায় কি! আমি কিন্তু পরশুই আসব ভাই। এ ক'দিনের জন্য অর্ধেক মাসের ভাড়া দেব কিন্তু। পুরো মাসের দেব না আগেই বলে রাখছি।

সুরবালা আড়াল থেকে কান পেতে সব কথাই শুনছিল। খানিক পরে সে চা আর শিঙ্গাড়া নিয়ে ঘরে ঢোকে।

: এসে বাইরের ঘরেই বসে রইলেন? অন্ততঃ একটা খবর তো দিতে হয়!

: খবর পেয়েছেন সে তো দেখতেই পাচ্ছি—খাবার এসে গেছে। দু'দিন বাদে স্থায়ীভাবে ভেতরে ঢুকছি, সবাইকে নিয়ে। জ্বালাতনের একশেষ হবেন।

: জ্বালাতন হতেই তো চাই!

বিলাসময়ের মুখের দিকে চেয়ে—সুরবালা যেন আড়াল থেকে কিছুই শোনে নি কিছুই জানে না এই ভাবে বলে, কথাবার্তা ঠিক হয়ে গেল?

: হ্যাঁ। ও রাজী হয়েছে। পরশুদিন আসবে বলছে।

সুরবালা বলে, বেশ তো, ভালই। কাল সন্ধ্যায় তাহলে লেখাপড়াটা করে ফেলুন? না পরশু সকালে আসবেন?

সুধীর শিঙ্গাড়া চিবোতে চিবোতে বলে, কাল সন্ধ্যাবেলাই আসব।

পরশু আসব সবাইকে নিয়ে।

সুধীর আর বড় ছেলে বিশুর গায়ের জোরের উপর নির্ভর করে গাড়ী থেকে নেমে টলতে টলতে বাড়ীর ভিতরে যাওয়ার সময় অলকাকে দেখেই টের পাওয়া যায় গত সন্ধ্যায় সুধীর কোথা থেকে কিভাবে সংগ্রহ করে এনে পাঁচশো টাকা আগাম দিয়ে ঘর ভাড়ার চুক্তিপত্র সই করেছিল। অলকার গা খালি। সুরবালার ঠিকা ঝির মাকে কানে আর হাতে যেটুকু সোনা আছে, অলকার গায়ে সেটুকুও নেই। সোনা-বাঁধানো একটি লোহা পর্যন্ত নয়! শুধু কপালে সিঁদুর আর হাতে শাঁখা।

পাঁচশো টাকা আগাম দিয়ে আশী টাকা মাসিক ভাড়ায় যে মানুষটা ঘর ভাড়া করে তার বৌ যখন স্বর্ণচিহ্নলেশহীনা হয়ে ভাড়া করা ঘরে ঢোকে তখন কি আর অনুমান করতে কষ্ট হয় যে মেয়ের বিয়ে দিয়ে গয়নাগাঁটি যা কিছু অবশিষ্ট ছিল তাই দিয়ে ঘর ভাড়া আগামের টাকাটা সংগ্রহ করা হয়েছে।

পুষ্প নিজেই গাড়ী থেকে নামে খুব সাবধানে। আজকেই কোন একসময় তার প্রসববেদনা সুরু হলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

সুরবালার মেয়ে বিনতা পুষ্পর সমবয়সী, বিয়ের আগে দু'জনের গলায় গলায় ভাব ছিল। বিয়ের পর দু'জনের দেখা হয়েছে কদাচিৎ— বছরে দু'একবার।

তবু কুমারী জীবনের সখিত্ব কি শেষ হয় বিয়ের পর কয়েক বছরের অদর্শনে? বিনতার ছেলেপিলে হয়নি এখনো, সে শুধু বেড়াতে এসেছে বাপের বাড়ী,—উৎসুক আগ্রহে সে এগিয়ে যায়, পুষ্পকে বলে, বাঃ বেশ, বিয়ে তো সবারি হয়, এর মধ্যে এমন কাণ্ড করেছিস?

পুষ্প তারি মুখে নিস্পৃহভাবে সংক্ষেপে বলে, কাজ আবার কি? তুই নিশ্চয় ঠেকিয়েছিস?

হায়, সখিত্ব শেষ হয়ে গেছে তাদের। কোন স্বার্থের কোন টানাটানি থাকে না বলে যে ছেলেমানুষী সখিত্ব জমায়েৎ থাকে আজীবন —একযুগ পরে ঘটনাচক্রে কয়েক ঘণ্টার জন্যে দেখা হলে দুটি ধর্ষিতা নিপীড়িতা মনেও আবার ছেলেমানুষী রূপক রসের আমেজ লাগে— সেই সখিত্ব তাদের তিতো হয়ে গেছে।

কেন হয়েছে সে তো জানা কথাই।

প্রথম কাজ বিছানা পেতে অলকাকে শুইয়ে দেওয়া, তারপর ঘরসংসার গুছানো। সুরবালা অলকার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়।

: রোজ জ্বর আসে নাকি?

: রোজ।

অলকা খুক্ খুক্ করে কাসে। শঙ্কিত চিন্তিত দৃষ্টিতে সুরবালা চেয়ে থাকে। কে জানে এ কি রোগ বাড়ীতে ঢোকানো হল? বেশী মেলামেশা ঘেষাঘেষি চলবে না।

ছেলেমেয়েদের সুরবালা সাবধান করে দেয়।

এক বাড়ীতে সপরিবারে দুটি বন্ধু—বাড়ীওলা ও ভাড়াটে সম্পর্ক। ক'দিন আগেও রাস্তায় দেখা হলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলতে বলতে কখন ঘণ্টা কাবার হয়ে গেছে টের পাওয়া যায়নি, আজ এত কাছাকাছি এসেও দু'চার মিনিটের বেশী আলাপ হয় না—তাও আবার ছাড়াছাড়া ভাসাভাসা আলাপ! সময় আছে ঢের—হঠাৎ যেন বক্তব্য ফুরিয়ে গেছে উভয় পক্ষের! দূরে দূরে দুটি ভিন্ন বাড়ীতে থাকার সময় যেমন নিজের নিজের ভাবনা নিয়ে তারা মসগুল থাকত, সেই দূরত্বই যেন এসেছে একবাড়িতে পার্টিশনের দু'পাশের মধ্যে!

পার্টিশন শুধু ঘর দু'খানার জন্ত। সদর দরজা এক, কল বাথরুম এক, বারান্দার একটু অংশ ঘিরে তৈরী নতুন রান্নাঘর ও সুরবালার রান্নাঘরে যাওয়া-আসা একই বারান্দা দিয়ে।

দূরত্বটা তাই স্পষ্ট অনুভব করা যায়—প্রত্যেকে অনুভব করে: কাছে আসার বাস্তবতাটা বাতিল করার কৃত্রিম বিশ্রী দূরত্ব।

মাসকাবারে সুধীর অর্ধেক মাসের ভাড়া দিতে গেলে বিলাসময় বলে, থাকগে, এ ক'টা দিনের ভাড়া দিতে হবে না। একেবারে সামনের মাস থেকে দিও।

ঃ তা কি হয়! কথা যা হয়েছে সেটা শুনতে হবে বৈকি!

মাসের মাঝামাঝি পুষ্প তিনদিন দারুণ কষ্ট পেয়ে একটি ছেলে বিয়োয়, বাচ্চাটা মারা যায় পরদিন। বাচ্চাটা মারা যাওয়ায় কেউ বিশেষ দুঃখিত হয়েছে মনে হয় না, বরং আরও একটা দায় থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য একটু স্বস্তিই যেন সকলে বোধ করে—পুষ্প পর্যন্ত।

ছেলেপিলে হয়ে মারা গেলে শুধু চুকেবুকে যায় হাঙ্গামা, মায়ের পর্যন্ত আপসোষ হয় না, অবস্থার ফের এমনও করে দিতে পারে এইসব স্নেহাতুরাদের? পেটের দায়ে ছেলেমেয়ে বেচে দেবার কাহিনী আজও এই দুর্ভিক্ষের দেশে শোনা যায়। কিন্তু সেক্ষেত্রে বাপ-মার তো এই হিসাবটাও থাকে যে অন্যের হয়ে যাক, ছেলেমেয়ে তো উপোস দিয়ে মরার বদলে বাঁচবে।

কোন হাসপাতালে বেড খালি পাওয়া যায়নি। অন্য প্রসবাগারে দেওয়া যেত—কিন্তু বেডের ভাড়া আর আনুসঙ্গিক খরচ বড় বেশী। বাড়ীতে ভাল ডাক্তার আনা যেত; কিন্তু ভাল ডাক্তারের ভাড়া বড় চড়া। সাধারণ যে ডাক্তার সুধীর এনেছিল সেও পুষ্পর কষ্টভোগ কমাতে পারত, বাচ্চাটাকে হয় তো বাঁচাতে পারত কিন্তু···এখানেও

সেই একই কিন্তু—সেজন্য যে-চিকিৎসা দরকার ছিল তার জন্য খরচ দরকার ছিল অত্যধিক।

জামাইকে টাকা পাঠাতে জরুরী তার করেছিল। ছাঁটাই-বেকার জামাই এসেছিল খালি হাতে—সব চুকেবুকে যাওয়ার পর জামাইকে তার ফিরে যাবার গাড়ীভাড়া দিতে হয়েছে।

সকলেই প্রায় নির্বিকারভাবে হিসাব-কষা স্বস্তির সঙ্গে বাচ্চাটার মরণকে স্বীকার করেছে, সুধীর পারেনি। এই তার প্রথম নাতি বলে নয়, ওসব সখ আর সুখের হিসাব তার চুকে গেছে। সে ছাড়া বাড়ীর কেউ জানে না যে চেষ্টা করলে—টাকা খরচ করলে—বাচ্চাটাকে বাঁচানো যেত। সেই শুধু জানে। সেই শুধু জানে যে, মেয়েটার তিনটি দিনরাত্রি ধরে অমন বীভৎস যন্ত্রণাভোগও প্রয়োজন ছিল না।

মেয়েটার জন্যই একরকম মরিয়া হয়ে দু'টি ঘরের জন্য সে পাঁচশো টাকা যোগাড় করেছে, দেড়শ' দুশো টাকার জন্যে সেই মেয়েটাকে ঠিকমত প্রসব করানো গেল না।

সুধীরের বুকটা তাই জ্বলে যায়—আপশোষে ক্রোধে ক্ষোভে ঘৃণায় বিতৃষ্ণায়!

তবু শান্ত নির্বিকারভাবেই সে মাসকাবারে দুশো টাকা বেতন থেকে আশী টাকা বিলাসময়ের হাতে গুণে দেয়, ষ্ট্যাম্প আঁটা রসিদ গ্রহণ করে।

তারপর একদিন হঠাৎ স্তম্ভিত বিস্ময়ের সঙ্গে বিলাসময় ও সুরবালা টের পায় সুধীর তাদের কিছু না জানিয়েই ঘর দু'খানার ন্যায্য ভাড়া ঠিক করে দেবার জন্যে রেণ্ট কন্ট্রোলারের কাছে দরখাস্ত করেছে।

ভাড়া নির্দিষ্ট হয় চল্লিশ টাকা। যে আশী টাকা সুধীর দিয়েছে

তার অর্ধেক টাকা পরবর্তী মাসের অগ্রিম ভাড়া হিসেবে জমা হয়।

সব ঢুকেবুকে যাবার পর সদর দরজায় খিল লাগিয়ে ভেতরে এসে বিলাসময় আকাশে গলা তুলে চীৎকার করে বলে, এত বড় বজ্জাত তুমি! বন্ধু সেজে বন্ধুর সঙ্গে এই ব্যবহার! এই মতলব ঠিক করে তুমি ঘর ভাড়া নিয়েছিলে? বেরোও তুমি আমার বাড়ী থেকে। তোমার আগাম টাকা, ভাড়ার টাকা পাই পয়সাটি পর্যন্ত ফিরিয়ে দিচ্ছি, বেরিয়ে গিয়ে রেহাই দাও আমায়!

সুরবালা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেচায়ঃ বন্ধুর বেশে এ কোন্ সর্বনেশে শনি ঘরে ঢুকেছে গো!

ঘর দু'খানা থেকে কোন জবাব আসে না। শুধু শোনা যায় সুধীর বিষ্ণুকে ধমকাচ্ছেঃ চুপ করে থাক। কথাটি বলবি না।

বিলাসময় ধৈর্য হারিয়ে গাল দিয়ে বলে, হারামজাদা, জুয়াচোর বজ্জাত! বেরো তুই আমার বাড়ী থেকে। তোদের আমি ঘাড়ে ধরে লাথি মেরে বাড়ী থেকে তাড়াব।

বিষ্ণু কলেজে পড়ে। তার আহত তীব্র কণ্ঠ শোনা যায়ঃ চুপচাপ গালাগালি শুনবে বাবা?

জবাবে সুধীরের দৃঢ়কণ্ঠ শোনা যায়ঃ দিক না গালাগালি। ছোট-লোক মানুষ আর কুকুর ঘেউ ঘেউ করে। আমাদের কি বয়ে গেল? পুলিশ ডেকেও তো আমাদের তুলতে পারবে না। তুই চুপ করে বসে থাক্।

ঃ চুপচাপ গাল শুনব!

বিষ্ণুর কথা প্রায় আর্তনাদের মত শোনায়।

বিলাসময় গর্জন করে বলে, এই শূয়ার বেরোলি ঘর থেকে?

তীরবেগে বিষ্ণু ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। বিলাসময়ের সামনে

রুখে দাঁড়িয়ে বলে, শুয়ার বলছেন কাকে ?

সুরবালা আঁতকে উঠে স্বামীর গায়ের গেঞ্জি টেনে ধরে বলে, থাক থাক, চুপ কর। পরে বিহিত হবে।

বিলাসময় বিষ্ণুর গালে একটা চাপড় বসিয়ে দেয়। বলে, শুয়ার বলছি তোর বজ্জাত জুয়াচোর বাপকে।

সেটা উভয়পক্ষের কমন বারান্দা। বারান্দার এ প্রান্তে সুধীরদের জন্য সংক্ষেপে ঘেরা রান্নাঘর—পুষ্প সেখানে চালকুমড়ার তরকারী রেঁধে কুচি করে কাটা চোকলা দিয়ে ছেঁচকি রাঁধতে রাঁধতে খন্তি হাতে বেরিয়ে এসে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

বিষ্ণু তার হাতের সেই সস্তা চিলতে খন্তিটা কেড়ে নিয়ে বিলাসময়ের ঘাড়ে খাঁড়ার মত কোপ মারে। খন্তির ঘায়ে মানুষের গায়ের চামড়ার চলটা পর্যন্ত তোলা যায় না দেখে সে বোধ হয় ক্ষেপে যায়।

বারান্দার এদিকে শেষপ্রান্তের দেয়াল ঘেঁষে বিলাসময়ের কয়লা রাখা হয়। এক একখানি আস্ত ইঁট দিয়ে ঘরোয়া কয়লা গুদামটির সীমা প্রাচীর করা হয়েছে। বিষ্ণু অবশ্য অনায়াসে ওই আলগা ইঁট তুলে নিয়ে বিলাসময়কে মারতে পারত।

তার বদলে সে কয়লারই একটা সাত আট সেরি চাপড়া তুলে নিয়ে বিলাসময়ের মাথায় প্রাণপণে ঠুকে দেয়। আগের দিন বিকালে বিলাস ময়ের দু'মণ কয়লা এসেছিল। দু'মণ কয়লায় তার তের দিন চলে। বিলাসময় কাত হয়ে পড়ে যায়। মনে হয় সে যেন সুরবালার কোলেই ঢলে পড়েছে।

তার ফাটা মাথা দিয়ে গলগল করে রক্ত বেরিয়ে আসে।

———